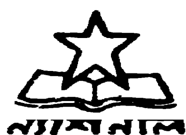
প্রেমচন্দ

নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ

সম্পাদনা : ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা



ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

Nirbachita Prabandha Sangraha
Premchand

জানুয়ারী—১৩৬৭

প্রকাশক :
সুনীল বসু
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ :
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রক :
রামপ্রসাদ নাগ
সারদা প্রিণ্টার্স
১৭-এ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা-৭০০ ০১২

দুটি কথা

প্রেমচন্দের নাম বাঙালী পাঠকদের কাছে যতটা পরিচিত তাঁর রচনা ঠিক ততটা পরিচিত নয়। প্রেমচন্দের অনুবাদ ভারতের অন্যান্য কয়েকটি ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষায় কম অনূদিত হয়েছে। বন্ধুবর ডক্টর ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৫১) বাংলায় প্রেমচন্দের সর্বপ্রথম গুণগ্রাহী ও অনুরাগী। বাংলায় তিনিই প্রথম প্রেমচন্দ সম্বন্ধে লেখেন।

১৯৫৫-এ প্রেমচন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোদানে'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তারপরে তাঁর তিনশ'র মতো গল্পের মধ্যে ভালমন্দ মিলিয়ে একশ'র মতো গল্প অনূদিত হয়ে পুস্তকাকারে ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর আরো একখানি উপন্যাসের তর্জমাও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রেমচন্দের শেষ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ মহাজনী সভ্যতার অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। এ ছাড়া তাঁর প্রবন্ধের তেমন অনুবাদ হয়নি।

তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ ও টিপ্পনির বেশ কয়েকটি অনুবাদ এই বইতে দেওয়া হল। এগুলি প্রেমচন্দের চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পাঠকদের কিছুটা সাহায্য করবে। বিশেষ করে ১৯১৯ সালের গোড়ায় লেখা পুরানা-জামানা নয়া-জমানা ও মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে লেখা 'মহাজনী সভ্যতা' (১৯৩৬) পড়লে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে প্রেমচন্দ ভারতীয় সাহিত্যে অদ্বিতীয়। এই পুস্তকের 'মহাজনী সভ্যতা' প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন ডঃ অমু সেন ১৯৫১ সালে। সেটি আমরা কিঞ্চিৎ সংশোধন করে এখানে দিয়েছি। এই প্রবন্ধের গোড়ায় ফারসীর যে পংক্তি দুটি দেওয়া আছে সেটির রচনাকারীর নাম প্রেমচন্দ দেননি। প্রথম প্রকাশের বিয়াল্লিশ বছর পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক হিন্দী পত্রিকা 'স্বাধীনতা'য় সর্বপ্রথম কবি হাফিজ শিরাজীর নামটি দেওয়া হয়।

এই পুস্তকে প্রেমচন্দের ঐতিহাসিক গল্প 'দুনিয়াকা অনমোল রতন' সংকলিত হয়েছে। 'সোজে ওতন' নামক গল্প সংগ্রহে প্রকাশিত হবার পর সরকার বইটি ১৯০৯ সালে বাজেয়াপ্ত করে। এই প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশের হমীরপুর জেলার কালেক্টর প্রেমচন্দকে বলেন যে তোমার ভাগ্য ভাল, আগেকার যুগে এই রকম গল্প লিখলে তোমার হাত দুটি কেটে ফেলা হত।

প্রেমচন্দ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার লেখক। উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যে তিনি সমালোচনামূলক বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রগতি লেখক সম্মেলনের প্রথম সভাপতি (১৯৩৬)। তাঁর গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধরাজি যেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের এক বিশ্বকোষ। সাহিত্যকে তিনি চিত্ত-বিনোদনের জন্য নয় বিপ্লবী সামাজিক পরিবর্তন সাধনের হাতিয়ার মনে করতেন। এই পরিবর্তন আনতে যে শ্রেণী সক্ষম তিনি সেই শ্রেণীর পরম বন্ধু ছিলেন।

তলস্তয়কে লেনিন রুশ বিপ্লবের দর্পণ বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তলস্তয়ের পূর্বে রুশ সাহিত্যে মুঝিক (কৃষক) ছিল না। প্রেমচন্দই সর্বপ্রথম ভারতীয় সাহিত্যে সংগ্রামী কৃষককে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর শ্রমিক কৃষকদের সম্বন্ধে চিন্তাধারার কিছু পরিচয় আমরা পাই প্রবন্ধগুলির মধ্যে। তর্জমা ও সম্পাদনার কাজে কমরেড সুনীল বসু ও ডক্টর শুভেন্দুশেখর মুখার্জী নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

অলমিতিবিস্তারেন।

মহাদেবপ্রসাদ সাহা



পুরানা জমানা : নয়া জমানা

পুরানো যুগে সভ্যতার অর্থ আত্মার সভ্যতা ও আচারের সভ্যতা মনে করা হত। বর্তমান যুগে সভ্যতার অর্থ হল স্বার্থ ও আড়ম্বর। তার [সভ্যতার] নৈতিক দিক বাদ পড়েছে। তার চেহারা এখন বদলে গিয়ে যা হয়েছে তাকে প্রাচীনেরা অসভ্যতা বলতেন। শারীরিক পরিপাটা ও জাঁকজমক পুরানো ধরনের দৃষ্টিতে কখনো ভাল মনে করা হত না। ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহ করা কখনই পুরানো সভ্যতার লক্ষ্য ছিল না। প্রাচীনেরা কৃত্রিমতা ও বাহ্যিক আড়ম্বরকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তখন সভ্য বলে গণ্য হবার জন্য ব্যাঙ্কে আপনার কত শেয়ার আছে, আপনার চুল আলবার্ট ফ্যাসানে ছাটা, আপনার দাড়ি ইটালিয়ান বা ফ্রেঞ্চ, আপনার কোট শিকারী কি টেনিস, কি কেম্ব্রিজ কি চীনা, কি জাপানী, আপনার জুতো ডার্বি কি পাম্পসু, তার প্রয়োজন ছিল না। আপনার সেরওয়ানী বা সেলীমশাহী জুতোর দিকে তাদের নজর পড়ত না। তারা সেটাকে অহঙ্কার বলুক, লোক-দেখানো বলুক, চাল বলুক কিন্তু কখনও তাকে সভ্যতা বলে কলঙ্কিত করত না। যা নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আন্তরিক তাকে তারা সভ্যতা বলতেন। তখনকার দিনে যার আবার পবিত্র, যে গম্ভীর, হাসিখুশি ও বিনয়ী সেই ব্যক্তি সভ্য বলে গণ্য হত।

বড় বড় রাজা মহারাজা সন্ন্যাসী দেখে সমাদরে উঠে দাঁড়াত, তাঁদের সম্মান করত এবং কেবল আনুষ্ঠানিক বা লোক-দেখানো সম্মান নয়, অন্তর থেকে সে তাঁদের চারিত্রিক শুদ্ধতা ও আধ্যাত্মিকতার সম্মুখে মাথা নত করত, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকে জীবনের একটি পরম প্রাপ্তি বলে মনে করত। এর প্রভাব তাদের মনের উপর অবশ্যই পড়ত। সিদ্ধার্থ, অশোক, শিলাদিত্য, জনকের উপাসনা, বৈরাগ্য, তপস্যা এই সৎসঙ্গেরই পরিণাম। তাদের স্বাধীনতা লক্ষ্য

করুন, তারা নিজের মতাদর্শের জন্য সিংহাসন ও রাজমুকুটের পরোয়া করত না। আর এই স্বার্থপরতার যুগে রাজা মহারাজারা পায়ে শেকল বাঁধা সত্ত্বেও বাদশা হবার জন্য প্রাণপাত করে। মিসর—,ইরান—,ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাসে জনক ও অশোকের উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু আজ যদি কেউ তার সিংহাসন ত্যাগ করে নির্জনে বসবাস করে তা হলে বুঝতে হবে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

প্রাচীন সভ্যতা সর্বজন-সুলভ ও প্রজাতান্ত্রিক ছিল। তাকে পরখ করার যে কষ্টিপাথর ধন ও ঐশ্বর্যের দৃষ্টিতে ছিল, সেই কষ্টিপাথর আপামর সাধারণের দৃষ্টিতেও ছিল। গরিব ও ধনীদের মধ্যে তখনকার দিনে কোন প্রাচীর ছিল না। সেই সভ্যতা গরিবদের অপমান করত না, তাকে ব্যঙ্গ করত না, তাকে বিদ্রূপও করত না। জ্ঞান ও উপাসনা, গাম্ভীর্য ও সহিষ্ণুতার সম্মান রাজাও করত, কৃষকও করত। তাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হলেও সভ্যতার মাপকাঠি ছিল এক। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা সাধারণ ও অসাধারণ, ছোট ও বড়, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে একটি প্রাচীর তুলে দিয়েছে। কোন মনিহারীর দোকানে যান, কোন ওষুধের দোকান বা সওদাগরের দোকান দেখুন, আপনি বুঝতে পারবেন বর্তমান সভ্যতা কত সীমাবদ্ধ ও বিভেদে ভরা। সেখানে দেখতে পাবেন সাবান ও বিস্কুট, ল্যাভেণ্ডারের শিশি, কুন্তল কৌমুদী ও দস্তানা, বেল্ট, টাই, কলার, ব্যাগ, ট্রাঙ্ক আর না জানি কত বিলাস সামগ্রী, পেটেণ্ট ওষুধ থরে থরে সাজানো রয়েছে কিন্তু আপনার দেশের ক'জন লোক এগুলি থেকে লাভবান হয়ে থাকেন? আধুনিক শিক্ষায় বঞ্চিত আপনার ভাই আপনাকে এই জাঁকজমকের মধ্যে দেখে এ কথাই মনে করে যে এই লোকটি আমাদের আপন নয়। আমিও তার আপন নই। তারপর আপনি যতই তারস্বরে জাতীয়তা নিয়ে চীৎকার করুন না কেন, সে আপনার দিকে ফিরে তাকাবে না। সে আপনাকে পর বলে মনে করবে। আপনার সার্কাস ও থিয়েটারে সেই সহজ সৌন্দর্য কোথায় যা পুরানো দিনের মেলায় ও তামাশায় পাওয়া যেত? আপনার কাব্যে সেই আকর্ষণ কোথায় যা পুরানো যুগের ভজনে ছিল, যেগুলি শুনে ধনী ও গরিব, রাজা ও প্রজা সকলেই অভিভূত হয়ে যেত? আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা জনসাধারণকে তার পরিধি থেকে বের করে দিয়েছে। তার ভিত্তি আড়ম্বরের ওপর স্থাপিত। ভোগ, ব্যসন ও স্বার্থপরতা তার আত্মা! এসব সত্ত্বেও গণতান্ত্রিকতাকে আধুনিক সভ্যতার সর্বপ্রধান গুণ বলা হয়।

বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে ভাল দিক জাতীয় ভাবনার উন্মেষ। এই নিয়ে তার গর্ব এবং সেটাই ঠিক। কিন্তু প্রাচীনকালেও জাতীয় ভাবনা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। গ্রীস ও পারস্যের যুদ্ধ, স্পেন ও আরবদের যুদ্ধ, ভারত ও আফগানিস্তানের ঝগড়া কিছু না কিছু অংশে জাতীয়তার উদয় ও জাতীয় গৌরবের ভিত্তিতে ঘটেছিল। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা এই ভাবনাকে একটি সংগঠিত, অনুশাসিত, একতাবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত রূপ দিয়েছে। পুরানো যুগে এই চেতনা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে দেখা দিত। কোন অপমানের প্রতিশোধ, কোন বিদ্রূপের জ্বালা বা কেবলমাত্র বীরত্ব প্রদর্শন ও বিজয়ী হবার উৎসাহ কিছু ব্যক্তিকে একতাসূত্রে বেঁধে দিত। এটা ছিল এক উচ্ছ্বাস যা কিছুক্ষণের জন্য হৃদয়কে নাড়া দিত। এটা ছিল এক তুফান যা কিছু সময়ের জন্য জলের স্থিরতাকে তোলপাড় করে দিত, কিন্তু এটা শেষ হতেই—তুফানের জোর শেষ হতেই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলি তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসত। আর কিছু দিন পরে এই যুদ্ধগুলির স্মৃতি মুছে যেত বা তার রেশ থাকলেও তা থাকত কবিদের কবিতায়। প্রায়ই ধর্মপ্রচারের জন্য জিভের চেয়ে তরবারির সাহায্য নেওয়া হত। পুরানো দিনের কাহিনীগুলি আজ পর্যন্ত নারায়ে তকবীর (আল্লাহ্ আকবর) ও তকবীরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু সেগুলি অস্থায়ী, ক্ষণিক ধ্বনি। এগুলি রাষ্ট্রকে শেষ করে দিল, রাজ্যকে ধ্বংস করে দিল, প্রলয়ের দৃশ্য সৃষ্টি করল, সংস্কৃতির চিহ্ন লুপ্ত করে দিল, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে এগুলি ব্যক্তিগত ও অস্থায়ী ঘটনা। এর বিপরীত হল আধুনিক রাষ্ট্র যা একটি স্থায়ী, টেকসই, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আবশ্যিক ভাবনা। এর ভিত্তি কোন ব্যক্তিগত সত্তা বা ধর্ম প্রচারের ওপর নয়। পক্ষান্তরে এর ভিত্তি নির্দিষ্ট সমষ্টির উপকার, সেবা, শান্তি ও দৃঢ়তার ওপর। এটা পারিবারিক, সাংস্কৃতিক বা ধার্মিক সম্পর্ক থেকে ভিন্ন। বাহ্যত এর ভিত্তি ভৌগোলিক সীমার ওপর। অভ্যন্তরীণ দিক থেকে উদ্দেশ্যের একতার উপর। সে মধু ও দুধের নদী নিজের মুঠোর মধ্যে রাখতে চায় ও অন্য কাউকে সে এর এক চুমুকও দিতে চায় না। সে সুখে নিজের পেট ভরতে চায়; তাতে দুনিয়া মরে মরুক; সে হাসবে, দুনিয়া রক্তে ও অশ্রুপাতে ভাসুক। যদি তার লাল কাপড় পরার শখ পেয়ে বসে এবং যদি সেই লাল রঙ একমাত্র রক্ত থেকে পাওয়া যায় তা হলে অন্যদের খুন করতে সে দ্বিধা বোধ করবে না। যদি মানুষের হৃৎপিণ্ড তার শরীরকে শক্তিশালী করে তো হাজার মানুষকে তার

ছোরার আঘাতে নিশ্চিত ছটফট করতে দেখা যাবে। সে নিজের অস্তিত্বকে দুনিয়ায় সবচেয়ে জরুরী মনে করে। আর সব শেষ হয়ে গেলে তার কিছু যায় আসে না। স্বার্থপরতা তার ধর্ম, তার ধর্মগ্রন্থ, তার পথ, তার সব কিছু। সমস্ত মনুষ্যোচিত অনুভূতি, নৈতিক প্রশ্ন এই মনস্কামনার সাকার মূর্তির সামনে মাথা নত করে। এটা হল কল ও মেশিনের যুগ এবং রাষ্ট্র এ যুগের সবচেয়ে স্পষ্ট অভিব্যক্তি। এই দেবতার মতো মেশিন দিন রাত পাগলের মতো গতিতে কিন্তু সেপাইর মতো শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে থাকে। কেউ এর আওতায় এলে দেখতে দেখতে তাকে গিলে ফেলবে, তাকে পিষে ফেলবে, সে কাউকে দয়া করে না, কারুর সঙ্গে আপস করে না। সে একটি বিরাট রোলার যার ব্যবসা ও প্রভুত্বের দুটি লাল লাল চোখ ভ্রূকুটি করে অনভিজ্ঞ লোকদের সাবধান করে দেয়—খবরদার, সামনে এসো না, তাহলে নিমিষে মারা পড়বে। আধুনিক রাষ্ট্র দুনিয়াকে এক রক্তাক্ত জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন করেছে। যেসব মানব-গোষ্ঠী এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের আকার গ্রহণ করেনি, তারা তার অত্যাচারের ক্ষেত্র। সে আফ্রিকায় যায় এবং সেখানকার জঙ্গল ও উপত্যকাগুলির কৃষ্ণকায় কাফ্রীদের শেষ করে দেয়। সে এশিয়ায় আসে এবং সভ্যতা ও শিক্ষার আওয়াজ তোলে। তার সাদৃশ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সে কাউকে গোলামীর শিকল পরায় না, নর ও নারীকে গোলাম বানায় না, শহরগুলিকে পুড়িয়ে ফেলে না কিন্তু এক বিচিত্র যোগাযোগ এই যে, যে 'অ-রাষ্ট্র' দেশ এই রাষ্ট্রের হাতে বন্দী হল, তার জীবন নিরাশা ও অপমানের যূপকাষ্ঠে বলি হল।

প্রাচীন যুগকে অন্ধকারের যুগ বলা হয় কিন্তু সেই অন্ধকার যুগে সৈনিকের কাজ প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত, রাজা কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে পারত না। বাহাদুরী প্রদর্শনে মত্ত হয়ে কর্তব্য বা বন্ধুত্ব বা বিশুদ্ধ লোভের বশে লোকে অস্ত্রধারণ করত। কিন্তু এই আলোকপ্রাপ্ত যুগ প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যার জন্য তৎপর করেছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধ্বনি তারস্বরে প্রচারিত হয়, কিন্তু সত্য হল এই যে রাষ্ট্র ব্যক্তিকে শেষ করে দিয়েছে, ব্যক্তির অস্তিত্ব রাষ্ট্র বা স্টেটের মধ্যে সমাহিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা রাষ্ট্রের গোলাম। তার এই অধিকার আছে যে সে কোন ফ্যাসাদ বাধিয়ে অন্যকে খুন করতে বাধ্য করুক। লঙ্কায় বিভীষণ তার ভাই রাবণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল, কিন্তু বিভীষণ স্বাধীনভাবে লঙ্কায় থাকত। রাবণের কোন দিন এই সাহস হয়নি যে সে

বিভীষণের কেশাগ্র স্পর্শ করে। আজকালকার যুদ্ধের যুগে এই প্রকারের রাজদ্রোহ কোর্ট মার্শালের কারণ হত। বিদুর কৌরবদের কাছ থেকে বৃত্তি পেত কিন্তু প্রকাশ্যেই পাণ্ডবদের সাহায্য করত। তবুও কৌরবরা যাদের কর্তব্যজ্ঞানহীন বলা হয়, এই নির্ভীক স্পষ্টতার জন্য বিদুরকে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য মনে করেননি। কিন্তু আপনি যাই বলুন, সেটা ছিল অন্ধকার যুগ, দাসত্ব ও দূরবস্থায় জর্জরিত ও দুঃখী। আর এই যুগে শত্রুর কৃতিত্বকে স্বীকার করা হল অধর্ম, এখন রাষ্ট্রীয় ধর্ম থেকে শুধুমাত্র বিচ্যুত হওয়া ক্ষমার অযোগ্য পাপ. এটা জাজ্বল্যমান। আলোকের অর্থ হল বিজলী বা গ্যাসের আলো। কিন্তু যদি আলোর অর্থ সত্তার স্বাতন্ত্র্য আত্মিক ও সামাজিক শান্তি হয়, তা হলে সেই অন্ধকার যুগ এই আলোকের যুগের চেয়ে অনেক বেশী আলোকময় ছিল। রাষ্ট্রের শক্তি ও প্রভুত্বের কাছে এই সব পতঙ্গকে আত্ম-বলিদান দিতে হবে। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল কারখানার উন্নতি, নানা প্রকারের যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, যা নিয়ে নূতন যুগের এত গর্ব, এটা বিশুদ্ধ সৌভাগ্যের ব্যাপার ; যখন সিগারেটের দাম নামমাত্র, বোতাম ও টিনের খেলনা কেউ পোঁছে না কিন্তু দুধ, ঘি, মকাই আর জোয়ারের [এক প্রকারের কদন্ন] স্থায়ী আকাল দেখা দেয় ; যখন গ্রামগুলি উজাড় হয়ে যাচ্ছে ও শহরের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে ; যখন প্রাকৃতিক সম্পদকে লাথি মেরে লোকে মেকী লোক-দেখানো সামগ্রীর জন্য প্রাণপাত করছে ; যখন অসংখ্য মানব-সন্তান পূতি গন্ধময় অন্ধকার কুঠরীতে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে ; যখন লোকে তাদের জাতির ও প্রতিবেশীদের শিক্ষা না নিয়ে কাম লালসার শিকার হয়ে চলেছে ; যখন বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্রিক শহরে সতীত্ব বাউণ্ডুলে ও তিক্ত বিরক্ত হয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরছে (লণ্ডনে চল্লিশ হাজারের অধিক বেশ্যা আছে ও কলকাতায় ষোল হাজারেরও বেশি ; যখন মেহনত করে জীবিকা অর্জনকারী মানুষ পুঁজিপতিদের গোলাম হয়ে রয়েছে. যখন স্রেফ পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ীদের মুনাফার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও ঝাঁপিয়ে পড়তে লোকে পেছপা নয়.; যখন তারা বিদ্যা, কলা ও আধ্যাত্মিকতা ও লাভ লোকসানের আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে ; কুশল রাজনীতিজ্ঞদের ভণ্ডামি ও ছল-চাতুরি হাঙ্গামা সৃষ্টি করে রেখেছে এবং ন্যায় ও সত্যবাদিতা নিয়ে সোরগোল স্রেফ অত্যাচারিতদের কণ্ঠরোধের জন্য করা হয়। তখন নূতন সভ্যতার কোন কট্টর সমর্থকও এই কষ্ট ও গোলামির কাল-চক্রকে বিশুদ্ধ আশীর্বাদ বলার সাহস করতে পারে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে

দেশের নেতা এর দোষগুলির সঙ্গে পরিচিত আছেন এবং একে শোধরাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যে বিষ সমাজব্যবস্থার সঙ্গে মিশে গিয়েছে তাকে দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে না। কেবলমাত্র তার বাইরের প্রভাব ও বিকৃতিগুলিকে লুকোতে ও নিশ্চিহ্ন করতে মানুষ চেষ্টা করছে। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শরীরকে রঙিন কাপড় দিয়ে ঢাকা হচ্ছে।

নূতন যুগ মানবীয় সদ্‌গুণগুলিকেও খামখেয়ালিভাবে বিভাজিত করে দিয়েছে। প্রাচীন যুগেও শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে বিভেদ ছিল কিন্তু নৈতিক তত্ত্বে বিশিষ্ট ও সাধারণ, বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। নম্রতা ও সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও সম্মান, সদাচার ও দাক্ষিণ্য এই গুণগুলির সকলে আদর করত সে মোগল হোক বা তুর্ক, ব্রাহ্মণ হোক বা শূদ্র। কিন্তু আজ অবস্থা ভিন্ন। এগুলি দুর্বলদের গুণ। নম্রতাকে আজ দুর্বলতার স্বীকৃতি বলে মনে করা হয়। লাজ-শরম হ'ল পৌরুষহীনদের গুণ। মিষ্টি কথা, সুন্দর আচরণ ও চক্ষুলজ্জা নূতন ট্যাকশালের বাতিল মুদ্রা। দয়া ও প্রার্থনা, সংযম ও শান্ত স্বভাবকে ভীরুতা ও হতাশা বলে মনে করা হয়।

এখন বাগাড়ম্বর ও অহংকারের যুগ। ক্রোধ, ঘৃণা, ঔদ্ধত্য, কটুকথা—এগুলি হ'ল পুরুষালি বৈশিষ্ট্য। যদি কারো কোনো কথা অগ্রাহ্য করতে হয় তো ভদ্রভাবে বলার প্রয়োজন নেই, সাফ ও স্পষ্ট বলুন। এতে ঔদ্ধত্য যত বেশি থাকে ততই ভাল। নাকে যেন মাছি না বসতে পারে, তলওয়ার সর্বদা খাপের বাইরে থাকা চাই। যদি কোনো কথা মনের মতো না হয়, তাহলেই অগ্নিশর্মা হয়ে যান। ক্রোধ একটি পুরুষালি কৃতিত্ব। তাকে সংযত রাখা কাপুরুষতার অজুহাত। আপনার কোন কিছুর লেশমাত্র জ্ঞান না থাকুক কিন্তু মুখে বলুন আপনি ঐ বিষয়ে আরিস্টোটল। শীতলতা, মানবিকতা ও সঙ্কোচকে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। এগুলি গরিব ও নিরুপায়দের গুণ। আপনি নিজ আচরণে বাহাদুর, স্পষ্ট বক্তা হোন। অপরের চিন্তাভাবনার প্রতি নজর দেওয়ার আপনার কোন প্রয়োজন নেই, আর লজ্জার নামটা করাই অপরাধ। এই হল এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

আমরা একথা বলি না যে যা-কিছু পুরানো সব প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু সেগুলি যতই খারাপ হোক না কেন এবং সেগুলি সম্বন্ধে যতই কটুকাটব্য করা হোক না কেন, সেগুলি এই নূতন স্বার্থপরতা, অহংকার ও আড়ম্বরের চেয়ে অনেক গুণ ভাল। মজার কথা হল এই যে ছেলেবেলা থেকেই এই নৈসর্গিক গুণগুলিকে

শেষ করে দেবার চেষ্টা করা হয়। এই পুরুষালি গুণ শিশুদের তাদের দুধের সঙ্গেই খাওয়ানো হয়। নূতন যুগের মন্ত্র জপকারী বলবে এটা হল একতরফা চিত্র। দেখুন, আজকের দিনে জাতীয় বোঝাপড়া মানব-সম্বন্ধকে কত দৃঢ় করেছে। একজন ইংরাজ ব্যবসায়ীর প্রতি চীনে কোন অন্যায় হলে সারা ইংলণ্ডে সোরগোল শুরু হয়ে যায়। রক্তের দাম ও আইনী যুদ্ধের জিগির তোলা হতে থাকে। যদি কোন রাজ্যে ফরাসী খবরের কাগজের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয় তা হলে ফ্রান্সে তোলপাড় হতে থাকে। এই সহানুভূতি, এই একতা কি আগে কখনো ছিল? মুসলমানদের অধীনস্থ রাজপুতরা রাজপুতদের হত্যা করত। মুসলমানরা শিখদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলমানদের হত্যা করত। নিঃসন্দেহে এটা নূতন যুগের একটি ভাল দিক এর দৌলতে আমরা দুনিয়ার সব জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারি, প্রত্যেক প্রদেশে ব্যবসা করতে পারি। কিন্তু এটা বাস্তব ঘটনা যে, এই একতা ও সংহতি মানবিকতার চেয়ে রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের ওপর অধিক নির্ভরশীলতা। না হলে কি কারণে যে কোন সুদূর দেশের এক মানুষের কষ্ট বা অপমান সেই জাতির হৃদয়কে নাড়া দেয়, কিন্তু নিজের প্রতিবেশীর ও বন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দেখে হৃদয় এতটুকুও বিগলিত হয় না? এর কি কারণ যে, ধন ও ঐশ্বর্যের তরীতে বসে ইউরোপীয় পুঁজিপতি সেই অনাথদের কথা চিন্তা করে না যারা দুরবস্থার ঘূর্ণিপাকে হাবুডুবু খাচ্ছে। স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা এই রাষ্ট্রের আত্মা।

এটা নিছক স্থূল জড়বাদ যা, সুন্দর ভাবনা চিন্তারহিত হৃদয়কে কঠোর, সঙ্কীর্ণ ও চিন্তাহীন করে তুলেছে। এটা পয়সাওয়ালাদের একটি চক্র যারা নৈতিক ভাবনাত্মক বস্তুগুলিকে ব্যবসায়িক লাভ লোকসানের দৃষ্টিতে দেখে, যার কাছে সেই পরোপকারই পালনযোগ্য যা সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, সেই ভাবই ভালো যাতে তার প্রভুত্ব বাড়ে। সে আত্মাকেও দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে। একে গণতন্ত্র বলা ভুল। সে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে পায়ের তলায় এমন ভাবে দলিত করেছে যে এখন তার চেহারাই চেনা যায় না। তার কাছে মানুষের মূল্য এই যে সে টাকা উপায় করার একটি যন্ত্র! সে কসাইর মতো মানুষের মাংস ও চামড়ার আন্দাজ করে তার মূল্য নির্ধারিত করে। বলার অর্থ এই যে পুরানো যুগ আমীর ও সুলতানদের যুগ ছিল আর নূতন যুগ হল বেনে ও ব্যাপারীদের। এ যুগ ধন দৌলতের পাহাড় খাড়া করে দিয়েছে, দৌলতের সন্ধানে বন জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে আসমানের শেষ প্রান্তে পৌঁছেচে আর এখন সমগ্র দুনিয়া হল এর কার্যক্ষেত্র।

এই নূতন যুগের এমন এক উজ্জ্বল দিক আছে যা তার কালো দাগগুলিকে কিছুটা ঢেকে দেয় এবং সেটা হল 'বোবাদের বাকশক্তিকে অবকাশ দেওয়া'। হালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তার এদিকটাকে আরো প্রকট করে দিয়েছে। স্বার্থপরতার তুফান বড় বড় মহীরুহকেই নয়, ঘুমন্ত ও শোষিত সবুজ মাঠগুলিকেও জাগিয়ে দিয়েছে। এখন একজন উপোসী মজুরও নিজের গুরুত্ব বুঝতে আরম্ভ করেছে। সে ধন দৌলতের দেউড়াতে মাথা নোয়াতে আর পছন্দ করে না। সে তার কর্তব্যের কথা না জানুক কিন্তু নিজের অধিকারকে পুরোদস্তুর জানে। সে জানে যে এই রাষ্ট্রে তাবৎ সম্পদ ও প্রভুত্বের মূল আমি। রাষ্ট্রের সমগ্র বিকাশ ও উন্নতি আমারই হাতের বিস্ময়কারী কাজ। সে এখন চুপচাপ ও সন্তুষ্ট থেকে এবং মাথা নত করে সব কিছু স্বীকার করে নেওয়ায় বিশ্বাস করে না।

এখন মজদুর যুগ চলছে। সেও আরাম, নিশ্চিন্ততা ও ভাল অবস্থার দাবি করে। সেও ভাল ঘরে থাকতে চায়। ভাল খাবার খেতে চায়, চিত্তবিনোদনের জন্য অবসর দাবি করে এবং সে তার দাবিগুলিকে এমন কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেছে যে কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে চালিয়াতি করতে পারে না। সে পুঁজির শত্রু, ব্যক্তিগত সম্পত্তির কবর-খননকারী এবং ব্যাপারীদের জোট-বদ্ধতার বিনাশকারী। এটা সত্য যে সেও তার প্রভাবের ক্ষেত্রকে ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই রাখতে চায়। কিন্তু নিজের শাসনের ক্ষেত্রে সাম্য ও সত্যের সে সমর্থক। সে নিজের রাষ্ট্রকে একক শাসন করতে চায়। প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য একই প্রকারের সুযোগ, একই প্রকারের সুবিধা, একই প্রকারের উন্নতির ব্যবস্থা দাবি করে। সকলের ঐক্য তার রণধ্বনি। ছোট বড়র পার্থক্যকে শেষ করে তাবৎ জমিকে সমান করার চেষ্টা করে। সে এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যাতে ধনোপার্জনের সমস্ত উপায়গুলি তার হাতে থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পরিশ্রম ও যোগ্যতা অনুসারে সমানভাবে বিতরণ করা যায়। সে জমিদারদের একটি নোংরা ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস বলে মনে করে এবং তাদের সম্পত্তিকে তাদের কব্‌জা থেকে বের করে জনগণের কব্‌জায় আনতে চায়। সংক্ষেপে বলা যায়, সে সমস্ত সম্পত্তি, কারখানা, রেল, জাহাজের ওপর এক বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা জনগণের অধিকারের দাবি করে। আর কে বলবে যে একাজ খুব কঠিন নয়। ব্যক্তিগত মালিকানার চিন্তাধারা মানুষের স্বভাবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা তার সবচেয়ে শক্তিশালী চালক শক্তি। এর ওপরেই তার জীবনের সমস্ত বাসনা, সমস্ত ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত। 'ব্যক্তি'র সত্তা

মুছে ফেলা দুষ্কর। পুঁজি ও সম্পত্তির সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রাম করতে হবে (কয়েকটি দেশে এটা চলছে) এবং হালচাল দেখে মনে হচ্ছে যে এ যুদ্ধে সে হেরে গিয়েছে কিন্তু তার প্রভাব এখনও বর্তমান ও সেটা বাড়তেই থাকবে। পুঁজিকে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আরো কিছু রেয়াৎ করতে হবে, আঁকা-বাঁকা পথ নিতে হবে, কিছু কৌশল করতে হবে, তবে তার সঙ্গে লড়ে সে নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করবে না।

জনগণের এই আন্দোলন ও দাবিগুলি কোমল কানে যতই অসহ্য মনে হোক না কেন এটা কিন্তু সেই নিস্তব্ধ মৌনের তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত। পুরানো যুগের আপন বৈশিষ্ট্য যা এখনো এশিয়ার কয়েকটি দেশে চলছে, তা আগুনে পুড়ে, তরবারির ঘা খেয়ে আঃ-উঃ করে না, সহ্য করা, ছটফট করা, তার বৈশিষ্ট্য ছিল। নূতন যুগের এই সবচেয়ে সজীব দিক ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতির দেশগুলিতে শূদ্রদের শেষ করে দিয়েছে। ওখানে এখন এমন কেউ নেই যে ধনীদের অত্যাচারের ফরিয়াদকে, বৈশ্যদের স্বর্ণ-সিংহাসনকে বইতে রাজি হয়।

কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার গণতন্ত্রের এই নতুন দিক নিজের ভৌগোলিক পরিধির বাইরে এসে দুর্বল ও অনাথদের রক্ষা করবে ও সহানুভূতি দেখাবে এবং পুঁজিপতি রাষ্ট্রদের বদলে অ-রাষ্ট্রগুলিকে অধিক মানবতা ও সহৃদয়তা দেখাবে তা মনে করা বোধহয় ভুল হবে। তার রাজসিংহাসন ও স্বর্ণ মুকুটের বাসনা নেই। কিন্তু সরকারী অধিকারের চিন্তা ও রাজ্য শাসন করার বাসনা থেকে সে মুক্ত নয়। খুব সম্ভব যে 'অ-রাষ্ট্র'গুলির ওপর এই গণতন্ত্রের অত্যাচার পুঁজিপতিদের চেয়ে অধিক সাংঘাতিক প্রমাণিত হতে পারে। যখন মুষ্টিমেয় পুজিপতিদের স্বার্থপরতা দুনিয়ায় ওলট পালট সৃষ্টি করতে পারে তা হলে একটি পুরো রাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তির স্বার্থপরতা কি কিছু করে দেখাবে। সেও জোটবাঁধার একটি দিক যা আরো বেশি বলিষ্ঠ। সে নিজের দেশের ব্যক্তিগত প্রভুত্বকে শেষ করে তার জায়গায় জনগণের প্রভুত্বের পতাকা তুলবে কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তার ভিত্তিও স্বার্থ। আর যতক্ষণ তার পা থেকে এই শিকল দূর না হচ্ছে, সে মানবিক ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যে এতটুকুও কাছে পৌছাতে পারবে না, যা সংস্কৃতির লক্ষ্য।

কিন্তু নূতন যুগের এই টানাহ্যাঁচড়া ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অহঙ্কার ও ভৌতিকতার জগৎব্যাপী অন্ধকারে আশার এক কিরণ দেখা যাচ্ছে। সেটা হ'ল রাষ্ট্রপতি উইলসন প্রস্তাবিত লীগ অফ নেশন্স বা রাষ্ট্রসংঘ। আমরা আমাদের অক্ষম ও দুর্বল চোখে সেই কিরণের দিকে দাঁড়িয়ে দেখছি। আমাদের পায়ের

শক্তিহীনতা আমাদের সেদিকে এগুতে দিচ্ছে না। আমাদের হৃদয় আশায় ভরা। এই কিরণ আমাদের কঠিন গন্তব্যের কোন আশ্রয়স্থলের সন্ধান দিচ্ছে বা এটা শুধু মরীচিকা, সেটার সমাধান আগামী দিনগুলি শীঘ্রই দেখিয়ে দেবে। কিন্তু এটা যদি মরীচিকাই হয় তা হলে আমাদের কি কোন অভিযোগ উপস্থিত করার সুযোগ আছে? এই সংঘ সেই সব রাষ্ট্রের মঞ্চ হবে যাদের দেশে গণতন্ত্র স্থান পেয়েছে, যেখানে বহুসংখ্যক লোককে মুষ্টিমেয়রা শোষণ করে না, যেখানে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিচার বা ভেদ নেই। আমরা এখনও জাতীয়তার লক্ষ্যে পৌঁছাইনি, আর গণতন্ত্রের কথা তো বলা বৃথা। এই অবস্থায় যদি আমাদের এই সংঘে শামিল করার যোগ্য না মনে করা হয় তা হলে আশ্চর্য হওয়া বা অনুযোগ করা উচিত নয়। যখন এই সংঘে আসার জন্য ইংলণ্ডকে তার পরিধি অনেকখানি বিস্তার করতে হয়েছিল, এমন কি তার নারীজাতিও রাজনীতিক অধিকার পেয়ে গেল। যখন অষ্ট্রিয়াও জার্মানীর মতো দেশকে যাদের রাজনীতিক অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো, এই সংঘে প্রবেশ পাবার যোগ্য এইজন্য মনে করে না যে ওখানে এখনো ব্যক্তিগত প্রভাব মতাদর্শের চেয়ে বড় আর বিশাল সংখ্যক জনগণ মুষ্টিমেয় লোকের অধীনে, তা হলে হিন্দুস্তান কোন মুখে এতে শামিল হবার দাবি করতে পারে? সেখানকার জনগণ নির্জীব ও বিভ্রান্ত সমষ্টির চেয়ে বেশী কিছু নয়। এই ধ্বংসের জন্য আমরা সরকারকে দোষী করতে পারি না। সরকারের কার্যপদ্ধতি এ পর্যন্ত প্রবলদের সমর্থন করে এসেছে। জনগণকে এই জড অবস্থায় রাখার পুরো দোষ শিক্ষিত ও সম্পন্ন লোকদের। আমাদের স্বরাজের নেতাদের মধ্যে উকিল ও জমীদারদের সংখ্যাই সর্বাধিক। আমাদের কাউন্সিলেও এই দুই গোষ্ঠীকেই সামনে দেখা যায়। কিন্তু কত লজ্জার ও পরিতাপের কথা যে এই দু-দলের মধ্যে জনগণের প্রতি দরদী কেউই নয়! তারা নিজেদের স্বার্থ ও প্রভুত্বের নেশায় বুঁদ। তারা অধিকার ও প্রশাসনের দাবি করে, ধন ও বৈভবের প্রতি আসক্ত। জনগণের উপকারের জন্য নয়। কজন বড় বড় জমীদার, তালুকদার, বড় বড় ধনী অভিজাত কোটি কোটি মূক চাষীদের দরদী, মানবিক ও দেশভায়ের মতো ব্যবহার করে, যাদের ঘটনাক্রমে সরকার খোদ জনগণের নীরবতা তাদের ভাগ্যের বিধাতা বানিয়ে দিয়েছে? আপনি স্বরাজের হাঁকডাক করুন, সেল্ফ-গবর্নমেণ্টের দাবি করুন, কাউন্সিল সম্প্রসারিত করার দাবি করুন, খেতাব পাবার জন্য হাত পাতুন, জনগণের এসবের সঙ্গে কোন

সম্বন্ধ নেই। সে আপনার দাবিতে শামিল নয়, উপরন্তু যদি কোন অলৌকিক শক্তি তাদের মুখর করে দেয় তা হলে সে আজ খুব জোরে শঙ্খধ্বনি করে আপনার দাবির বিরোধিতা করবে। এর কোনো কারণ নেই যে সে অন্য দেশের হাকিমের চেয়ে আপনার শাসন বেশি পছন্দ করবে। যে রায়ৎ নিজের অত্যাচারী ও লোভী জমিদারের কবলে পড়ে রয়েছে, প্রবলদের অত্যাচার ও বেগার তাদের জর্জরিত করে দিচ্ছে তাদের হাকিম রূপে দেখতে তার কোন বাসনাই থাকতে পারে না।

এর কোন নিশ্চয়তা আছে কি যে আপনার কবলে পড়ে তার অবস্থা আরো খারাপ হবে না? আপনি এখন পর্যন্ত কোন প্রমাণ দেননি যে আপনি তাদের মঙ্গল চান। যদি কোন প্রমাণ দিয়ে থাকেন তা হলে সেটা হল তাদের অমঙ্গল করার এবং নিজের স্বার্থের লোভের, নীচতার। আপনি স্বরাজের কল্পনা করে খুব সমৃদ্ধ হোন ও বগল বাজান। কিন্তু অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই কর্তব্যের দিকেও নজর দেওয়া জরুরী। মূর্খ অভিজাত বা জমিদারদের আমরা দোষ দিতে চাই না। তাদের চোখ তখন খুলবে যখন তাদের গর্দান জনগণের হাতে হবে ও তারা নিরুপায় হয়ে এদিক সেদিক তাকাতে থাকবে। আমাদের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে যারা লেখা পড়া জানে এবং যারা জমিদার, ও উকিল। তারা তাদের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুক যে তারা কি প্রজাদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করছে? কখনো কখনো নিজেদের কুকর্ম ও ত্রুটিগুলির সম্বন্ধে নিজ অন্তরকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয়। তাদের অন্তর পরিষ্কার বলে দেবে যে তোমাকে এই দাঁড়িপাল্লায় মাপা হল ও তুমি নীচ প্রমাণিত হয়েছে। শহরের শান্তিপূর্ণ কোণ থেকে বেরিয়ে সেখানে যান যেখানে জনগণ বাস করে, যেখানে আপনার শতকরা নব্বই জন দেশবাসীর বসবাস, সেই অসহ্য অবস্থা আপনার হৃদয়ের ওপর প্রভূত আলোকপাত করবে। আপনার চোখ খুলে যাবে। অন্যায় ও অত্যাচারের দৃশ্য আপনার হৃদয় কাঁপিয়ে দেবে।

এটা কি লজ্জার কথা নয় যে, যে-দেশের শতকরা নব্বই জন কৃষক, সেই দেশে কোন কিসান সভা, কিসানদের উপকারের আন্দোলন, কোন কৃষি বিদ্যালয়, কিসানদের মঙ্গলের জন্য কোন সংগঠিত প্রচেষ্টা করা হয়নি! আপনারা শত শত স্কুল ও কলেজ স্থাপিত করলেন কিন্তু কার জন্য? স্রেফ নিজেদের প্রভুত্ব বাড়াবার জন্য। বোধহয় আপনার রাষ্ট্রে যে মান আপনার মাথায় ছিল সেট মনে রাখলে আপনার আচরণ আদৌ আপত্তিজনক নয়। কিন্তু নূতন যুগ এক টি·

নূতন অধ্যায় আরম্ভ করেছে। আগামী যুগ এবার কৃষক ও মজুরদের। জগতের গতি এর স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে। হিন্দুস্থান এই হাওয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি তাকে এই আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। শীঘ্রই বা বিলম্বে, বোধ হয় শীঘ্রই আমরা জনগণকে কেবল মাত্র মুখরই নয়, নিজের অধিকারের দাবিদার রূপে দেখতে পাবো এবং তখন সে আপনার ভাগ্যের বিধাতা হবে। তখন আপনার অন্যায়গুলির কথা আপনার মনে পড়বে এবং হাত কচলে আফসোস করবেন। জনগণের এই স্থিতাবস্থা দেখে ধোঁকায় পড়বেন না। বিপ্লবের পূর্বে কে জানত যে রুশ দেশের পীড়িত জনগণের মধ্যে এত শক্তি লুকিয়ে আছে? পরাজয়ের পূর্বে কে জানত যে জার্মানীর একছত্র স্বেচ্ছাচারী শাসক জনগণের জ্বালামুখীর ওপর বসে আছে। নিকট ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ মজুর ও কারিগর ফ্রান্স থেকে ফিরে আসবে, লক্ষ লক্ষ সেপাই যুদ্ধের পর আপন আপন ঘরে ফিরবে। আপনি কি মনে করেন তাদের ওপর স্বাধীন দেশের জলবায়ুর কোনই প্রভাব পড়বে না? যদি দেশের মধ্যে মানবতা থাকে ও লজ্জা শরম না থাকে, তা হ'লে নিজের লাভের জন্যই আমাদের এখন থেকেই জনগণের হৃদয় নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করতে হবে। সে অন্ধকার অযোধ্যার হোক বা আলোক প্রাপ্ত বাঙলার হোক, এই ব্যাপারে আমাদের জমিদার তালুকদাররা সব চেয়ে বেশী দোষী। তাদের উচিত এই ক্ষণের লোকসানের কথা চিন্তা না করে তারা কৃষকদের উপকার ও তাঁদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে। স্বেচ্ছায় সেই অধিকারগুলি থেকে তাদের হাত গুটিয়ে নিক যেগুলি তারা কৃষকদের নিকট প্রাপ্য মনে করেন। তাদের কাছে বেগার নেওয়া বন্ধ করুন, তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করুন, খাজনা বাড়ানো ও বেদখল করা বন্ধ করুন, যাতে জনগণের মনে তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখা দেয়। আমাদের কাউন্সিল সদস্য ও রাজনীতিক নেতাদের কর্তব্য হল তারা তাদের প্রস্তাবগুলির পরিধি বিস্তৃত করুন এবং জনগণের (অর্থাৎ কৃষকদের) সমর্থনের একটি প্রোগ্রাম তৈরি করুন এবং সেটাকে তাদের নিজের কার্যক্রম বলে গ্রহণ করুন। স্বরাজ্যের বেকার ও নিরর্থক ধ্বনির তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে থাকবার সময় আর নেই। কারণ আগামী যুগ এখন জনগণের এবং যারা যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারবে না তারা পস্তাবে।

ফেব্রুয়ারি ১৯১৯

জমানা, কানপুর

প্রেমচন্দ্রের আত্মচরিত

[ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে প্রেমচন্দ তাঁর সম্পাদিত 'হংস' পত্রিকার 'আত্ম-কথা' সংখ্যা প্রকাশিত করেন। এই সংখ্যায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীরা ও কিছু অন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা নিজের জীবন কথা লেখেন। প্রেমচন্দ নিজেও 'জীবন-সার' শীর্ষক তাঁর নিজের কথা লেখেন। প্রেমচন্দের এই রচনার তর্জমা দেওয়া হল।]

আমার জীবন সমতল মাঠের মতন। এতে কোথাও কোথাও গর্ত আছে বটে, কিন্তু টিলা, পাহাড়, গভীর উপত্যকা ও গুহার নামগন্ধ নেই। যে সজ্জনদের পাহাড়ে বেড়াবার শখ আছে, তাঁরা এখানে নিরাশ হবেন।

আমার জন্ম হয় ১৯৩৭ সম্বতে [১৮৮০ সনে]। পিতা ছিলেন ডাকঘরে কেরানী। মা থাকতেন অসুস্থ। এক দিদিও ছিলেন। তখন পিতা বোধহয় কুড়ি টাকা পেতেন। চল্লিশ টাকায় পৌছাতে পৌছাতে তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। এমনিতে তিনি দূরদর্শী, সাবধান ও দুনিয়ায় চোখ খুলে চলার লোক ছিলেন, কিন্তু শেষ বয়সে একটা হোঁচট খেলেনই। নিজে তো পড়লেনই, সেই হোঁচটে আমাকেও ফেলে দিলেন। পনেরো বছর বয়সে তিনি আমার বিয়ে দিলেন। এর কয়েক বছর পরেই তাঁর জীবনযাত্রা শেষ হয়। তখন আমি নবম শ্রেণীতে পড়তুম। পরিবারে আমার স্ত্রী, বিমাতা ও তাঁর দুছেলে ছিল কিন্তু আয় সিকি পয়সারও ছিল না। ঘরে যা ছিল, ছ মাস ধরে পিতার চিকিৎসায় ও তারপর শ্রাদ্ধাদিতে খরচ হয়ে গেল। আমার বাসনা ছিল এম. এ. পাশ করে উকিল হবার। সরকারী চাকরি পাওয়া সে যুগেও ততই মুস্কিল ছিল যেমন আজকার দিনে। দৌড়ঝাঁপ করে দশ-বারো টাকা মাসিকের কোনো কাজ পেয়ে যেতে পারতুম, কিন্তু আমাকে পেয়ে বসেছিল আরো পড়ার নেশা। পায়ে লোহার নয়, অষ্টধাতুর বেড়ি পরানো ছিল, আর আমি আরোহণ করতে চাইছিলুম পাহাড়ে।

পায়ে ছিল না জুতো, আর ছিল গায়ে না আস্ত কাপড়। তা ছাড়া ছিল জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য। যব ছিল টাকায় দশ সের। ইস্কুলে ছুটি হত সাড়ে

তিনটেয়। কুইন্‌স্‌ কলেজ বনারসে পড়তুম। হেডমাস্টার মাইনে মাফ করে দিয়েছিলেন। পরীক্ষা এসে পড়েছিল, আর আমি 'বাঁশকাকাটক'-এ একটি ছেলেকে পড়াতে যেতুম। শীতকাল ছিল। সন্ধে চারটায় পৌঁছতুম আর ছটার সময় ছুটি পেতুম। সেখান থেকে আমার বাড়ি ছিল পাঁচ মাইল দূরে। জোর কদমে হাঁটলেও রাত আটটার আগে বাড়িতে পৌঁছতুম না। সকাল আটটায় রওনা দিতুম, তা না হলে ইস্‌কুলে সময়মতো পৌঁছানো যেত না। রাত্রে খেয়ে কুপীর সামনে পড়তে বসতুম আর না জানি কখন ঘুমিয়ে পড়তুম।

ম্যাট্রিকুলেশনে তো কোনোক্রমে পাশ হয়ে গেলুম, কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করায় কুইন্‌স্‌ কলেজে ভর্তি হবার কোনো আশা রইল না। যারা প্রথম বিভাগে পাশ হত কেবলমাত্র তাদেরই মাইনে মাফ হতে পারত। সৌভাগ্যের কথা যে সেই বছর হিন্দু কলেজ খোলা হয়েছিল। আমি এই কলেজে পড়া ঠিক করলুম। প্রিন্সিপাল ছিলেন মিস্টার রিচার্ডসান। তাঁর বাড়িতে গেলুম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দিশি পোশাকে তার শরীর ঢাকা। ধুতি পরে মেজেতে বসে কিছু লিখছিলেন। কিন্তু স্বভাব বদলানো তত সহজ ছিল না। আমার প্রার্থনা শুনে (তখন আমার কথা অর্ধেকও বলা হয়নি) বললেন— "বাড়িতে আমি কলেজের কথা শুনি না।" নাচার হয়ে কলেজে গেলুম। দেখা হল বটে কিন্তু হতাশা ছাড়া আর কিছুই পেলুম না। এখন কি করি? যদি কারো সুপারিশ আনতে পারতুম তা হলে বোধ হয় আমার প্রার্থনার শুনানী হত। কিন্তু গাঁয়ের ছেলেকে শহরে কে চিনত?

রোজ বাড়ি থেকে এই প্রতিজ্ঞা করে বেরুতুম যে কোনোখান থেকে সুপারিশ লিখিয়ে আনি কিন্তু বারো মাইল হাঁটাহাঁটি করে সন্ধেবেলা খালি হাতে ঘরে ফিরে আসতুম। শহরে আমার কথা শোনার কেউই ছিল না।

কয়েকদিন পরে একটি সুপারিশ পেলুম। ঠাকুর ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ নামে এক ভদ্রলোক কলেজের ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে আমার করুণ কাহিনী শোনালুম। আমার ওপর তাঁর দয়া হল আর তিনি সুপারিশের চিঠি লিখে দিলেন। আমার আনন্দের সীমা রইল না। যা হোক খুশি মনে ঘরে ফিরে এলুম। পরের দিন প্রিন্সিপাল মশায়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঘরে ফিরেই আমার জ্বর হল আর দুসপ্তাহের আগে ছাড়ল না। নিমের পাচন খেতে খেতে জেরবার হয়ে গেলুম। একদিন দরজায় বসে আছি এমন সময় আমার পুরোত মশায় এসে পড়লেন। আমার

অবস্থা দেখে খবর জিজ্ঞেস করলেন। তক্ষুনি কোনো ক্ষেত থেকে একটি শেকড় খুঁড়ে আনলেন। সেটাকে ধুয়ে সাতটি গোল মরিচের সঙ্গে বেটে আমাকে খাইয়ে দিলেন। মন্ত্রের মতো কাজ হল। জ্বর আমার ঘণ্টাখানেক দেরি ছিল কিন্তু সেই ওষুধটা এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে গলা টিপে শেষ করে দিল। আমি বার বার পণ্ডিত মশায়ের কাছে শেকড়টির নাম জানতে চাইলুম কিন্তু তিনি বললেন না। বললেন যে নাম বলে দিলে সেটাতে আর কাজ হবে না।

যাহোক একমাস পরে মিস্টার রিচার্ডসানের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করলুম। তাকে ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সুপারিশের চিঠিখানি দেখালুম। ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

"এতদিন কোথায় ছিলে?"

"অসুখ করেছিল।"

"কি অসুখ?"

আমি এই প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিলুম না। যদি জ্বর বলি তা হলে হয়ত সাহেব আমাকে মিথ্যেবাদী মনে করবেন। আমার বুদ্ধিতে জ্বর সাধারণ রোগ ছিল যার জন্য এতদিন গরহাজির থাকার প্রয়োজন ছিল না, এমন কোনো অসুখের নাম করার কথা ভাবলুম যাতে নিরুপায় ও কষ্ট হওয়া ছাড়া দয়ার উদ্রেক হয়। সেই মুহূর্তে আর কোনো রোগের নাম আমার মনে পড়ল না। ঠাকুর ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সঙ্গে যখন সুপারিশের জন্য দেখা করি তখন তিনি তাঁর বুক ধড়ফড় করার রোগের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর কথা আমার মনে পড়ে গেল।

আমি বললুম, "প্যালপিটেশান অফ হার্ট স্যার।"

সাহেব আশ্চর্য চকিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"এখন তুমি সম্পূর্ণ ভালো আছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, ভর্তি হবার ফর্ম পূরণ করে আন।"

আমি মনে করলুম যাক্ কাজ হাসিল হয়েছে। ফর্ম পূরণ করে জমা করে দিলুম। সায়েব তখন কোনো ক্লাশে পড়াচ্ছিলেন। তিনটের সময় আমি ফর্ম ফেরৎ পেলুম। তাতে লেখা ছিল—"এর যোগ্যতা পরীক্ষা করা হোক।"

এই নূতন কঠিন ব্যাপার দেখে আমি হতাশ হয়ে গেলুম। ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে পাশ হবার আশা ছিল না, আর গণিত ও জ্যামিতির নাম

শুনে আমার হৃৎকম্প হতে যেটুকু মনে ছিল তাও ভুলে গিয়েছিলুম। এখন অন্য কোনো উপায় আর কি হতে পারে? কপাল ঠুকে ক্লাশে গেলুম। ফর্ম দেখালুম। প্রোফেসার বাঙালী ছিলেন। ইংরেজী পড়াচ্ছিলেন। ওয়াশিংটন আরভিঙের 'রিপ ভ্যান উইংকেল' (Rip Van Winkle) পড়ানো হচ্ছিল। আমি গিয়ে পেছনের সারিতে বসে পড়লুম এবং দু চার মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলুম যে প্রোফেসার নিজের বিষয়ে খুব পাকাপোক্ত ব্যক্তি। ঘণ্টা শেষ হলে সেই পাঠ সম্বন্ধে আমাকে নানান প্রশ্ন করলেন। আমার উত্তর শুনে আমার আবেদনপত্রে 'সন্তোষজনক' শব্দ লিখে দিলেন।

দ্বিতীয় ঘণ্টা ছিল গণিতের। এর প্রোফেসারও বাঙালী ছিলেন। আমি আমার ফর্ম দেখালুম। নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণত সেই সব ছাত্ররা আসে যারা অন্যত্র স্থান পায় না। এখানেও সেই অবস্থা ছিল। ক্লাসগুলি যোগ্য ও অযোগ্য ছাত্রে ভরা ছিল। প্রথম ধাক্কায় যারা এল ভর্তি হয়ে গেল। ক্ষুধাতে শাকপাতও সুস্বাদু মনে হয়। কিন্তু এখন পেট ভরে গিয়েছিল। বেছে বেছে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছিল। এই প্রফেসার গণিতে আমাকে পরীক্ষা করলেন আর আমি ফেল হয়ে গেলুম। ফর্মে গণিতের কোঠায় 'অসন্তোষজনক' লেখা হল।

আমি এতখানি হতাশ হলুম যে ফর্ম নিয়ে দ্বিতীয়বার প্রিন্সিপালের কাছে আর গেলুম না। সোজা ঘরে ফিরে এলাম। গণিত আমার কাছে হিমালয়ের চূড়ো যার ওপর আমি কখনো চড়তে পারলুম না। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় গণিতে দুবার ফেল করলুম এবং নিরাশ হয়ে পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দিলুম। দশ-বারো বছর পরে যখন গণিত ঐচ্ছিক (Optional) বিষয় হয়ে গেল তখন অন্য বিষয় নিয়ে আমি সহজেই ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করলুম। সেই সময় পর্যন্ত গণিত অনিবার্য বিষয় হওয়ায় শত শত ছাত্রদের বাসনা ধূলিতে মিশে গেল। যা হক, আমি হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে এলুম কিন্তু পড়ার ইচ্ছা যথাস্থানে কায়েম রইল। ঘরে বসে কি করতুম? কোনো প্রকারে গণিতে দড় হয়ে আবার কলেজে ভর্তি হবার নেশা পেয়ে বসেছিল। কিন্তু এর জন্য শহরে থাকার দরকার ছিল। ঘটনাক্রমে এক উকিলের ছেলেদের পড়াবার কাজ পেয়ে গেলুম। মাইনে ঠিক হলো পাঁচ টাকা। দুটাকায় নিজের গুজরান করে তিন টাকা বাড়িতে দেবার পাকা সিদ্ধান্ত করলুম। উকিলের আস্তাবলের ওপরে একটা ছোট কাঁচা কুঠরী ছিল। তাতে থাকার অনুমতি পেয়ে গেলুম। একখণ্ড চট পেতে

দিলুম। বাজার থেকে একটা ছোট লম্প বাতি কিনে আনলুম ও শহরে থাকতে লাগলুম। বাড়ি থেকে কয়েকটি বাসন কোশনও আনলুম। একবেলা খিচুড়ি করে নিতুম আর বাসন-পত্র মেজে ধুয়ে লাইব্রেরীতে চলে যেতুম। গণিত তো একটা ছুতো ছিল। নভেল ইত্যাদি পড়তুম। পণ্ডিত রতননাথ সরসারের 'ফিসানয়ে আজাদ'[৩] সেই সময় পড়ি। 'চন্দ্রকান্তা সন্ততি'ও[৪] পড়লুম। বঙ্কিম বাবুর উর্দু তর্জমা যে ক'খানি লাইব্রেরীতে পেলুম সব পড়ে ফেললুম। যে উকিলের ছেলেদের পড়াতুম তাঁর শালা ম্যাট্রিকুলেশানে আমার সঙ্গেই পড়ত, তার সুপারিশেই আমি ট্যুইশান পেয়েছিলুম। এই বন্ধুত্বের জন্য যখন দরকার হতো তার কাছে টাকা ধার করতুম ও মাইনে পাবার পর শোধ দিতুম। কখনও দু টাকা হাতে পেতুম, কখন তিন টাকা। যেদিন মাইনের দু তিন টাকা পেতুম আমার সিদ্ধান্তের রাশ আল্‌গা হয়ে যেতো। লোভাতুর চোখ ময়রার দোকানের দিকে টেনে নিয়ে যেত এবং দু-তিন আনা পয়সা খরচ না করে আমি ফিরে আসতুম না। তারপর সেইদিনই বাড়ি যেতুম ও দু-আড়াই টাকা দিয়ে আসতুম। পরের দিন আবার ধার করা শুরু করে দিতুম। কিন্তু কখনো কখনো ধার করতে সঙ্কোচও বোধ করতুম যার জন্য সারা দিন উপবাসব্রত পালন করতে হতো।

এই করে চার-পাঁচ মাস কেটে গেল। এরি মধ্যে এক কাপড়ওয়ালার কাছ থেকে দু-আড়াই টাকার কাপড় কিনেছিলুম। রোজ তার ওদিক দিয়েই যেতে হত। তার আমার ওপর ভরসা ছিল। যখন দুমাস হয়ে গেল আর আমি টাকা শোধ দিতে পারলুম না, তারপর ওর ওদিক দিয়ে যাওয়া আসা বন্ধ করে দিলুম। ঘুর পথে যেতুম। তিন বছর পরে তার টাকা শোধ করতে পেরেছিলুম। সেই যুগে শহরের এক বেলদার আমার কাছে হিন্দী পড়তে আসত। তার বাড়ি উকিলের বাড়ির পেছনের দিকে ছিল। 'বুঝেচ-ভাই' তার মুদ্রাদোষ ছিল। সেইজন্য সকলে তাকে 'বুঝেচ ভাই' বলত। একবার আমি তার কাছে আট আনা পয়সা ধার করি। এই পয়সা সে আমার গ্রামের বাড়ি থেকে পাঁচ বছর পরে আদায় করে! তখনও আমার পড়ার বাসনা ছিল কিন্তু দিনে দিনে হতাশ হয়ে পড়ছিলুম। মন চাইছিল পেলে কোনো চাকরি করি, কিন্তু চাকরি কি করে ও কোথায় পাওয়া যায়, আমার জানা ছিল না।

শীতকাল কিন্তু ট্যাঁকে একটা কড়িও ছিল না, দুদিন তো এক-এক পয়সার

ছোলা ভাজা খেয়ে কাটিয়ে দিলুম। আমার মহাজন ধার দিতে অস্বীকার করে দিয়েছিল। লজ্জায় তার কাছে ধার চাইবার সাহস হচ্ছিল না। প্রদীপ জ্বালানো হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় আমি এক বইয়ের দোকানে একটি বই বেচতে গেলুম। বইটি ছিল প্রোফেসার চক্রবর্তীর গণিতের সমাধান (Key): বইটি আমি দু'বছর আগে কিনেছিলুম। এতদিন আমি বইটি যত্ন করে রেখেছিলুম, আজ যখন চারদিক থেকে হতাশ হয়ে গেলুম তখন সেটাকে বেচে দেওয়া ঠিক করলুম। বইটির দাম ছিল দুটাকা। কিন্তু এক টাকা দাম সাব্যস্ত হল। টাকা নিয়ে দোকান থেকে নামামাত্র লম্বা গোঁফওয়ালা একজন গম্ভীর ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

"তুমি এখানে কোথায় পড় ?"

আমি বললুম, "কোথাও পড়ি না কিন্তু ভর্তি হবার চেষ্টায় আছি !"

"ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"চাকরি চাই না তো ?"

"চাকরি কোথাও পাচ্ছি না।"

সেই সদাশয় ব্যক্তিটি কোনো ছোট স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মাস্টারের প্রয়োজন ছিল। আঠারো টাকা মাসিক বেতনে আমাকে নিযুক্ত করলেন। সেই সময় এই আঠারো টাকা আমার হতাশ ইচ্ছার উচ্চতম সীমা ছিল। পরের দিন হেডমাস্টারের কাছে উপস্থিত হবার কথা দিয়ে যখন সেখান থেকে রওনা হলুম তখন মাটিতে আমার আর পা পড়ছিল না। এটা ১৮৯৯ সনের কথা। আমি আমার চতুর্দিকের অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য তৈরি ছিলুম। জ্যামিতির জন্য আটকে না গেলে আমি নিশ্চয়ই আরো এগুতে পারতুম। কিন্তু এই জ্যামিতি আমার বাসনাকে ধূলিসাৎ করে দিল।

সর্বপ্রথম ১৯০৭-এ আমি গল্প লিখতে[২] আরম্ভ করি। ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি গল্প আমি ইংরেজিতে পড়েছিলুম। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি তর্জমা করি। আমার প্রথম উপন্যাস ১৯০১ সনে লেখা শুরু করি। আমার একটি উপন্যাস ১৯০২-এ প্রকাশিত হয় ও দ্বিতীয়টি ১৯০৪-এ, কিন্তু গল্প সর্বপ্রথম ১৯০৭-এ লিখি। আমার প্রথম গল্পের নাম ছিল 'দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন', এই গল্প ১৯০৭-এ জমানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর

আমি 'জমানা'য় আরো চার পাঁচটি গল্প লিখি। ১৯০৯-এ পাঁচটি গল্পের সংগ্রহ 'দেশপ্রেমের আগুন' (সোজে ওতন) নামে 'জমানা' প্রেস, কানপুর থেকে প্রকাশিত হয়। সেই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছিল এবং কংগ্রেসে চরমপন্থীদের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল। এই পাঁচটি গল্পে দেশপ্রেমের গান গাওয়া হয়েছিল।

তখন আমি শিক্ষা বিভাগে ইস্কুলের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর ছিলুম। হমীরপুর জেলায় নিযুক্ত ছিলুম। বই প্রকাশিত হবার পর ছমাস হয়ে গিয়েছিল, একদিন রাত্রে আমি আমার ক্যাম্পে বসেছিলুম, সেই সময় কালেক্টারের আদেশ এল এক্ষুনি এসে দেখা করো। শীতকাল। গরুরগাড়ি তৈরি করালুম ও রাতারাতি তিরিশ-চল্লিশ মাইলের যাত্রা শেষ করে পরের দিন সায়েবের সঙ্গে দেখা করলুম। তাঁর সামনে 'সোজে ওতনের' এক খণ্ড রাখা ছিল। আমার মাথা ঘুরে গেল। তখন আমি 'নবাব রায়' নামে লিখতুম। আমি খানিকটা জানতে পেরেছিলুম যে গুপ্তচর পুলিস এই বইয়ের লেখকের খোঁজে আছে। আমি বুঝতে পারলুম যে তারা আমাকে খুঁজে বের করেছে এবং সায়েব তারই জবাবদিহি করার জন্য আমাকে তলব করেছে।

সায়েব আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এই বই কি তুমি লিখেছ?"

আমি বললুম, 'হ্যাঁ'।

সায়েব আমাকে প্রত্যেকটি গল্পের মানে জিজ্ঞেস করল ও শেষে রেগে বলল, "তোমার গল্প সিডিশনে (রাজদ্রোহ) ভরা। তোমার ভাগ্য ভালো যে ইংরেজদের রাজত্বে আছ। মোগলদের রাজত্ব হলে তোমার হাত দুটি কাটা যেত। তোমার গল্পগুলি একপেশে। তুমি ইংরেজদের রাজত্বের অপমান করেছ ইত্যাদি"। শেষে সিদ্ধান্ত হল যে আমি 'সোজে ওতন'এর সব কপিগুলি সরকারের হাতে তুলে দিই এবং ভবিষ্যতে সায়েবের অনুমতি ছাড়া কিছু না লিখি। আমি ভাবলুম যে যাক্ সস্তায় রেহাই পেয়েছি। মোট হাজার কপি ছাপা হয়েছিল, আমি বাকি বইগুলি 'জমানা' প্রেস থেকে আনিয়ে সায়েবকে নজর দিলুম।

আমি মনে করলুম আপদ শেষ হল। কিন্তু বিভাগীয় অফিসাররা এই টুকুতে সন্তুষ্ট হল না। এইজন্য আমি পরে জানতে পারি যে কালেক্টার সায়েব জেলার অন্য অফিসারদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে সলা-পরামর্শ করেছিল। পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, দুজন ডেপুটি কালেক্টার ও শিক্ষা বিভাগের যে ডেপুটি ইনস্‌পেক্টরের অধীনে আমি ছিলুম, আমার ভাগ্যের ফয়সালা করতে

বসল। এক ডেপুটি কালেক্টর সায়েব আমার গল্পগুলি থেকে প্রমাণ করল যে এগুলিতে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী ভাবনা ও বিপ্লবী চিন্তা ছাড় আর কিছু নেই। পুলিস বিভাগের বিধাতা বলল, এ ধরনের বিপজ্জনক লোকের সাজা পাওয়া দরকার। ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর সায়ের আমাকে খুব ভালবাসতেন। পাছে ব্যাপারটি নিয়ে তুলকালাম হয় এই আশঙ্কায় বললেন যে তিনি বন্ধুভাবে আমার রাজনৈতিক মতামতের অনুসন্ধান করে কমিটির কাছে নিজের রিপোর্ট পেশ করবেন। আসলে তিনি চাইছিলেন যে আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রিপোর্টে লিখে দিতে যে লেখক স্রেফ কলমের বীর কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তার কোনো রুচি নেই। কমিটি এই পরামর্শ মেনে নিল যদিও পুলিসের সেই বিধাতা তখনও পায়তারা কষে চলেছেন।

কালেক্টার ডেপুটি সায়েবকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আশা করেন যে সে নিজের মনের কথা আপনাকে বলে দেবে?"

ডেপুটি বলল, "ওর সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব।"

"আপনি বন্ধু সেজে তার মনের কথা জেনে নিতে চাইছেন। আমি এটাকে নীচতা মনে করি।"

ডেপুটি এই উত্তরের জন্য তৈরি ছিলেন না। সায়েবের কথায় ভয় পেয়ে বললেন, "আমি তো হুজুরের হুকুম···" কিন্তু সায়েব তার কথার মাঝখানে বললেন—"না, এ আমার হুকুম নয়। আমি এরকমের হুকুম দিতে চাই না। যদি বই থেকে সিডিশন প্রমাণ হয় তাহলে লেখকের বিরুদ্ধে খোলা আদালতে মোকদ্দমা চালানো হোক, আর তা না হলে সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হোক। মুখে এক কথা ও অন্তরে অন্য রকম, এ আমি পছন্দ করি না। মুখে রাম নাম, অন্তরে শানানো ছুরি, এ আমি পছন্দ করি না।"

কয়েকদিন পরে যখন ডেপুটি সায়েব আমাকে এই ঘটনার কথা জানালেন তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি কি সত্যিই আমার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষীর কাজ করতেন?"

তিনি হেসে বললেন, "না, তা করা অসম্ভব ছিল। কেউ লাখ টাকা দিলেও আমি তা করতে পারতুম না। আমি তো কেবল আদালতে মোকদ্দমা থামাতে চাইছিলুম এবং আমি খুশি হয়েছি যে সেটা থেমে গিয়েছে। মোকদ্দমা আদালতে গেলে সাজা হওয়া নিশ্চিত ছিল। এখানে আপনার তদবীর করার কেউ ছিল না। কিন্তু সায়েব বড় ভালো লোক।"

আমিও স্বীকার করলুম যে সত্যিই সায়েব খুব ভালো লোক।

হমীরপুরে থাকাকালীনই আমার[৩] আমাশা দেখা দিল। গ্রীষ্মকালে এখানে কোন সব্জি পাওয়া যেত না। একবার এক নাগাড়ে কয়েকদিন কচুর শুকনো তরকারি খেতে হল। একদিন পেটে এত ব্যথা হল যে সারাদিন মাছের মতো ছটফট করতে হলো। চূর্ণ খেলুম, গরম জলের বোতলে পেটে সেঁক দিলুম, কালোজামের আরক খেলুম। অর্থাৎ মফঃস্বলে যত রকম ওষুধ পাওয়া যায়, সব খেলুম কিন্তু ব্যথা কমল না। পরের দিন আমাশা হয়ে গেল কিন্তু ব্যথা আর রইল না।

এভাবে এক মাস কেটে গেল। এরপর আমি যখন এক ক্ষুদ্র শহরে পৌঁছলুম তখন সেখানকার দারোগা আমাকে থানায় থাকতে ও খেতে বললেন। কয়েক দিন ধরে মুগ ডাল খেতে খেতে ও নিষিদ্ধ সব কিছু বাদ দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলুম। ভাবলুম আপত্তির কি আছে, আজ এখানেই থাকা যাক্। সুস্বাদু খাবার তো পাওয়া যাবে। থানাতেই আড্ডা গাড়লুম। দারোগা ওলের তরকারি রান্না করালেন, পাকৌড়ি, দই বড়া, পোলাও, সব কিছু তৈরি করালেন। আমিও আশ মিটিয়ে খেলুম কিন্তু খেয়ে দেয়ে যখন থানায় দারোগার খড়ের বাংলোতে শুলুম তার দু-আড়াই ঘণ্টা পরে পেট ব্যথা করতে লাগল। সারারাত ও পরের সারাদিন কাতরাতে থাকলুম। দু'বোতল সোডা খাবার পর বমি হলে আরাম পাওয়া গেল। আমার বিশ্বাস জন্মাল যে ওলের জন্যই এত কাণ্ড ঘটেছে। তখন থেকে কচু ও ওলের চেহারা দেখলে আমার হৃদকম্প হয়। ব্যথা তো আর রইল না কিন্তু আমাশা স্থায়ী হয়ে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা পেটে অস্বস্তি বোধ করতুম। বদহজমের কষ্ট স্থায়ী হয়ে গেল। কিছুদিন কামাই না করে রোজ চার-পাঁচ মাইল বেড়াতে যেতুম। ব্যায়াম করতুম, নির্দিষ্ট খাদ্য খেতুম ও কোনো না কোনো ওষুধও খেতুম। কিন্তু আমাশা কমলো না। শরীর শুকিয়ে যেতে থাকল। কয়েকবার কানপুরে গিয়ে চিকিৎসা করালুম। একবার একমাস ধরে এলাহাবাদে কবরেজী ও এ্যালোপ্যাথী ওষুধ খেলুম। কিন্তু কোনো উপকার হলো না।

এরপর আমি বদলির জন্য দরখাস্ত করলুম। চাইছিলুম রোহিলখণ্ডে বদলি হোক্, কিন্তু পাঠানো হল বস্তী জিলায়। সেই অঞ্চলে পাঠানো হল যেটা নেপালের তরাইয়ের কাছে। সৌভাগ্যক্রমে এখানে আমার পরিচয় হল পণ্ডিত মন্নন দ্বিবেদী গজপুরীর সঙ্গে। তিনি তখন ডুমরিয়াগঞ্জের তহসিলদার

ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে কথাবার্তা হতো। কিন্তু বস্তীতে আসার পর আমাশার কষ্ট বেড়ে গেল। তারপর ছমাসের ছুটি নিয়ে লখনউ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা করালুম। এখানে কোন লাভ না হওয়ায় বনারসের এক হেকিমের চিকিৎসা করালুম। তিন চার মাস কিছুটা লাভ মনে হল, কিন্তু রোগ সমূলে গেল না। ছুটির শেষে বস্তী গেলে অবস্থা আগের মতো হয়ে গেল। এবার আমি বদলির চাকরি ছেড়ে দিয়ে বস্তী হাইস্কুলে মাস্টারির চাকরি নিলুম। এখান থেকে বদলি হয়ে গোরখপুর গেলে আমাশার কষ্ট আগের মতেই রয়ে গেল। এখানে আমার মহাবীরপ্রসাদ পোদ্দারের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি হিন্দী সাহিত্যের বিদ্বান, দেশমাতৃকার খাঁটি সেবক ও খুব কর্মঠ লোক ছিলেন। আমি বস্তীতে থাকাকালীন হিন্দীর 'সরস্বতী' পত্রিকায় কয়েকটি গল্প প্রকাশ করাই। পোদ্দারজীর পরামর্শে আমি 'সেবাসদন' নামে উপন্যাস লিখি। গোরখপুরে থাকার সময়ই আমি প্রাইভেটে বি. এ. পাস করি। সেবাসদনের প্রশংসায় আমার সাহস বাড়ে, আমি আমার দ্বিতীয় উপন্যাস 'প্রেমাশ্রম' লিখি। এর মাঝে গল্প নিয়মিত ভাবে লিখে চলেছিলুম।

পোদ্দারজীর পরামর্শে আমি জল-চিকিৎসা আরম্ভ করালুম। কিন্তু তিন-চার মাসের স্নান ও খাওয়া দাওয়া নিয়ন্ত্রণে উল্টো ফল হল। আমার পেট বড় হয়ে গেল ও চলা ফেরায় কষ্ট হতে লাগল। একবার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হলো। অন্যরা চট্ করে উঠে পড়ল কিন্তু আমার যেন পা উঠতে চায় না। বড় কষ্টে হাতের সাহায্যে উপরে উঠলুম। সেই দিন আমি আমার দুর্বলতার কথা বুঝতে পারলুম। এও বুঝতে পারলুম যে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। জল-চিকিৎসা বন্ধ করে দিলুম।

একদিন সন্ধেবেলা বাজারে শ্রীযুত দশরথপ্রসাদ দ্বিবেদী, সম্পাদক 'স্বদেশ'-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে কখনও কখনও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতো। আমার ফ্যাকাশে চেহারা দেখে বললেন—"বাবুজী, আপনি তো একবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছেন। চিকিৎসা করান।"

নিজের অসুখের উল্লেখ আমার ভাল লাগত না। আমি আমার অসুখের কথা ভুলে যেতে চাইছিলুম। যখন দু-চার মাস আরো বাঁচব, তা হলে হাসতে হাসতে কেন যাব না? আমি খেপে বললুম—"মরেই ত যাব ভাই, না আর কিছু হবে? আমি মৃত্যুকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত।" বেচারা দ্বিবেদীজী লজ্জায় মাথা নত করে নিলেন। পরে নিজের কটু কথার জন্য

আমার খুব আপসোস হল। এটা ১৯২০ সনের ঘটনা। সেই সময় অসহযোগ আন্দোলন জোরে চলছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় মহাত্মা গান্ধী গোরখপুর এলেন। গাজীমিয়াঁর মাঠে উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হল। সভায় তুলাখের কম লোক আসেনি। সারা জেলার শ্রদ্ধালু লোক ছুটে এসেছিল। এমন জনসমাবেশ এর আগে আমি জীবনে আর দেখিনি। মহাত্মার দর্শনের এমন প্রভাব যে আমার মতো মরা প্রাণে জীবন সঞ্চার হয়ে গেল। এর দু চার দিন পরেই আমি আমার কুড়ি বছরের সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিলুম।

এবার গ্রামে কিছু কাজ করার ইচ্ছে হল। গ্রামে পোদ্দারজীর বাড়ি ছিল। আমরা দুজনে সেখানে চলে গেলুম ও চরকা চালাতে লাগলুম। এক সপ্তাহের মধ্যে আমার আমাশা কমে গেল। এমন কি এক মাসের মধ্যে আমার স্বাস্থ্য একেবারে ঠিক হয়ে গেল। এরপরে আমি বনারস চলে এলুম। নিজের গ্রামে বসে প্রচার ও সাহিত্য রচনায় জীবন যাপন করতে লাগলুম। দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতেই আমি নবছরের পুরোনো রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলুম। এই অভিজ্ঞতা আমাকে পুরোপুরি ভাগ্যবাদী বানিয়ে দিল।

এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। মানুষের কোনো চেষ্টাই তাঁর ইচ্ছা ছাড়া সফল হয় না।

জমানা, প্রেমচন্দ সংখ্যা, ১৯৩২

জীবন ও সাহিত্যে ঘৃণার স্থান

নিন্দা, ক্রোধ আর ঘৃণা সবই দোষণীয়। কিন্তু মানব জীবন থেকে এই দোষণীয়গুলিকে বিদায় দিন তা হলে সংসার নরক হয়ে যাবে। এই নিন্দার ভয়ই দুরাচারীদের সংযত করে। এই ক্রোধই ন্যায় ও সত্যকে রক্ষা করে আর এই ঘৃণাই ভণ্ডামি ও শঠতা দমন করে। নিন্দার ভয় না থাকলে, ক্রোধের আতঙ্ক না থাকলে, ঘৃণার দাপট না থাকলে জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে আর সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। এগুলির আমরা যখন অপব্যবহার করি তখনই এগুলি দোষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দয়া, করুণা, প্রশংসা ও ভক্তিরও যদি অপব্যবহার করা হয় তা হলে এগুলি দোষণীয় হয়। অন্ধ দয়া তার পাত্রকে অপদার্থ করে, অন্ধ করুণা কাপুরুষ, অন্ধ প্রশংসা অহংকারী ও অন্ধ ভক্তি ধূর্ত করে। প্রকৃতি যা কিছু করে জীবনরক্ষার জন্যই করে। আত্ম-রক্ষা প্রাণীর সবচেয়ে বড় ধর্ম এবং আমাদের সব ভাবনাগুলি মনোবৃত্তি-গুলি এই উদ্দেশ্যকে পূরণ করে। কে না জানে যে, যে-বিষ আমাদের প্রাণ নাশ করতে পারে, সেই বিষ জীবনসঙ্কটও দূর করতে পারে। ঘটনা ও অবস্থায় প্রভেদ রয়েছে। মানুষ জঞ্জাল, দুর্গন্ধ, জঘন্য বস্তুকে স্বাভাবিক ভাবেই কেন ঘৃণা করে। কেবল এইজন্য যে জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া তার আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক। যে জীবে ঘৃণার অংশ বিকাশ লাভ করেনি, তাদের রক্ষার জন্য প্রকৃতি তাদের মধ্যে মরে যাওয়া, দম বন্ধ করা বা লুকিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সমাজের ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে মানুষ উন্নতির এমন স্তরে পৌঁছে যে ক্ষতিকর জিনিসগুলির প্রতি তার স্বভাবতই ঘৃণা জন্মায়। ঘৃণারই উগ্ররূপ হল ভয় আর পরিচ্ছন্ন রূপ বিবেক। এই তিনটি একই বস্তুর নাম, তাদের মধ্যে কেবল নামের তফাৎ।

তাহলে ঘৃণা স্বাভাবিক মনোবৃত্তি এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতি তা সৃষ্টি করেছে। একথা এভাবেও বলা যায় যে এটা আত্মরক্ষারই একটা রূপ। যদি আমরা এর থেকে বঞ্চিত হই তাহলে আমাদের অস্তিত্ব বেশি দিন থাকবে না। জীবনে যে বস্তুর এত মূল্য তাকে শিথিল হতে দেওয়া নিজের পায়ে কুড়োল মারার শামিল। আমাদের মধ্যে যদি ভয় না থাকে তা হলে

সোহাগের উদয় হবে কোথা থেকে। আর ঘৃণার উগ্র রূপ হল ভয়, তেমনি ভয়ের প্রচণ্ড রূপ হল সাহস। এর জন্য প্রয়োজন হল ঘৃণা পরিত্যাগ করে তাকে বিবেকে পরিণত করা। এর অর্থ হল এই যে আমরা ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে যেন তার মন্দ আচরণকে ঘৃণা করি। ধূর্তকে আমরা কেন ঘৃণা করি? এইজন্য যে তার মধ্যে ধূর্ততা রয়েছে। আজ যদি সে ধূর্ততা পরিত্যাগ করে তা হলে আমাদের ঘৃণাও দূর হয়ে যাবে। মদ্যপের মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ আসে তাই আমরা তাকে ঘৃণা করি কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন তার নেশা কেটে যায় তখন আমাদের ঘৃণাও অদৃশ্য হয়ে যায়। এক ভণ্ড পূজারীকে সরলপ্রাণ গ্রাম্য লোকদের ঠকাতে দেখে আমরা তাকে ঘৃণা করি কিন্তু আগামীকাল যদি সেই পূজারীকে আমরা গ্রামবাসীদের সেবা করতে দেখি তা হলে আমাদের তার প্রতি ভক্তি ভাবে দেখা দেবে। ঘৃণার উদ্দেশ্যই হল এই যে তার দোষগুলি দূর হোক। ভণ্ডামি, ধূর্ততা, অন্যায়, অহংকার এবং এই প্রকারের দুষ্প্রবৃত্তিগুলির প্রতি আমাদের মধ্যে যত প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মাবে ততই মঙ্গল হবে। ঘৃণা শিথিল হলেই আমরা প্রায়ই নিজেরাই সেই মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ি এবং নিজে সেই রকম ঘৃণ্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করি। যার মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণা আছে সে জীবনপণ করে সেগুলি থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এবং তখনি সে তাদের শেকড় উপড়ে ফেলার জন্য জীবনপণ করবে। মহাত্মা গান্ধী এইজন্য অস্পৃশ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য নিজের জীবন বলিদান দিচ্ছেন কারণ তিনি অস্পৃশ্যতাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন।

ডিসেম্বর ১৯৩১

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

জাতীয়তা বর্তমান যুগের কুষ্ঠরোগ যেমন মধ্যযুগের কুষ্ঠরোগ ছিল সাম্প্রদায়িকতা। ফলশ্রুতি দুটির একই। সাম্প্রদায়িকতা তার চৌহদ্দির মধ্যে পূর্ণ শক্তি ও সুখের রাজ্য স্থাপিত করতে চাইছিল, কিন্তু সেই চৌহদ্দির বাইরে যে জগৎ ছিল, তাকে লুটপাট করতে তার একটুও ক্লেশ হত না। জাতীয়তাও তার পরিমিত পরিধির মধ্যে রামরাজ্যের আয়োজন করে। সেই চৌহদ্দির বাইরের জগৎ তার শত্রু। সারা জগৎ এই রকম রাষ্ট্রে বা জোটে বিভক্ত এবং সকলে পরস্পরকে হিংসাত্মক সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। যতদিন এর শেষ না হবে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সচেতন ব্যক্তিরা জগতে আন্তর্জাতিকতার প্রচার করতে চায়, আর করছেও। কিন্তু জাতীয়তার বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা জগৎ তাদের 'ড্রিমার' (স্বপনচারী) বা বিদূষক মনে করে উপেক্ষা করে।

সন্দেহ নেই যে আন্তর্জাতিকতা মানব সংস্কৃতি ও জীবনের অনেক উচ্চ আদর্শ। আদি কাল থেকে জগতের মনীষীরা এই আদর্শ প্রতিপন্ন করেছেন। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই আদর্শের পরিচায়ক। বেদান্ত একাত্মবাদের প্রচারই করেছে। আজ জাতীয়তার রোগে ভোগে তারাই যারা শিক্ষিত ও ইতিহাস জানেন। তারা জগৎকে রাষ্ট্রের রূপেই দেখতে পারে। জগতের সংগঠনের অন্য কোনো কল্পনা তাদের মনে উদয় হয় না। যেমন শিক্ষার মাধ্যমে না জানি কত রকমের অস্বাভাবিকতা আমরা নিজের মাথায় ভরেছি, সেই রকম এই রোগও পুষে নিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কি করে। কিছু লোক মনে করেন যে জাতীয়তাই আন্তর্জাতিকতার পদক্ষেপ। এর সাহায্যে আমরা সেই পদে পৌঁছাতে পারি কিন্তু যেমন কৃষ্ণমূর্তি কাশীতে তার একটি ভাষণে বলেছেন যে এটা সেই রকম কথা হল যে আরোগ্য লাভ করার জন্য অসুস্থ হওয়া আবশ্যক।

তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে আমাদের আন্তর্জাতিকতার ভাবনা জাগবে কি করে?

আদি কাল থেকে সমাজ সংগঠন আর্থিক ভিত্তিতে হয়ে আসছে। যখন মানুষ গুহায় বাস করত তখনও জীবিকার জন্য ছোট ছোট দল তৈরি করতে হত। তখনও তাদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আর্থিক নীতিই জগতের পরিচালনা করে আসছে, আর এই প্রশ্নকে উপেক্ষা করে সমাজের অন্য কোনো সংগঠন হতে পারে না।

মানুষে মানুষে এই যে পার্থক্য, বিরোধ, বৈষম্য এই যে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক চাপা উত্তেজনা (tension) দেখা দিচ্ছে এর কারণ অর্থ ছাড়া আর কি ? অর্থের প্রশ্নের সমাধান করে জাতীয়তার কেল্লাকে ধ্বংস করা যেতে পারে।

বেদান্ত একাত্মবাদের প্রচার করে অন্য এক পথে এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছিল। বেদান্ত মনে করল সমাজের মনোভাব বদলে দিলে এই প্রশ্নের আপনাআপনি সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বেদান্ত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কারণ নিশ্চিত না করেই কার্যের নির্ণয় করার পরিণাম অসাফল্য ছাড়া আর কি হতে পারে ? যীশুখ্রীষ্ট, মহাত্মা বুদ্ধ সব ধর্ম প্রবর্তকরা মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের দ্বারা সমাজ ব্যবস্থা বদলাতে চাইলেন। আমরা একথা বলতে চাই না যে তাদের পথ ভুল ছিল। না, সেই পথ ঠিক ছিল, কিন্তু তার অসফলতার প্রধান কারণ ছিল এই যে সে অর্থকে নগণ্য মনে করেছিল। আন্তর্জাতিকতা বা একাত্মবাদ বা সমতা তিনটি মূলতঃ একই। একে অর্জনের দুটি পথ ঃ এক আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় বস্তুবাদী। আধ্যাত্মিক পথের পরীক্ষা আমরা ভালোভাবে করে নিয়েছি, কয়েক হাজার বছর ধরে আমরা এই পরীক্ষা করে আসছি। সেটা শ্রেষ্ঠতম পথ ছিল। সে সমাজের জন্য উচ্চ আদর্শ তাঁদের কল্পনায় ছিল এবং সেখানে পৌঁছানোর জন্য উচ্চ মতাদর্শের সৃষ্টি আমরা করেছিলুম। মানুষের স্বেচ্ছার উপর তার বিশ্বাস ছিল কিন্তু ফল দাঁড়াল এই যে ধর্মোপজীবিদের একটি বিশাল সংখ্যা পৃথিবীর বোঝা হয়ে দাঁড়াল। সমাজ যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল না, পিছিয়ে গেল। জগতে অনেক মত ও ধর্ম এবং কোটি কোটি ধর্মোপদেশকদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও যত বিরোধ হিংসার ভাব আছে তত বোধ হয় পূর্বে কখনও ছিল না। আজ দুই সহোদর একসঙ্গে থাকতে পারে না। এমন কি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিরোধ চলছে। প্রাচীন জ্ঞানীরা সমস্ত কলহের মূল 'জর, জমীন, জন' (সোনা, জমি ও স্ত্রী-এর) উপরে ধার্য করেছিলেন। আজ এর জন্য একটি শব্দই যথেষ্ট—সেটা হল সম্পত্তি।

যতদিন সম্পত্তি মানব-সমাজের সংগঠনের ভিত্তি, ততদিন জগতে আন্তর্জাতিকতার আবির্ভাব হতে পারে না। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, ভাই ভাই ও স্ত্রী পুরুষের মধ্যে লড়াইর কারণ হল এই সম্পত্তি। জগতে যত অন্যায় ও অনাচার, যত বিদ্বেষ ও মালিন্য রয়েছে, যত মূর্খতা ও অজ্ঞানতা রয়েছে, তার মূল রহস্য হল এই বিষটি। যতদিন সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে, ততদিন মানব

সমাজের উদ্ধার হতে পারে না। মজুরদের কাজের সময় কমান, বেকারদের জীবন ধারণের ভাতা দিন, জমিদার ও পুঁজিপতিদের অধিকার কমান আর কৃষকদের স্বত্ব বৃদ্ধি করুন, মুদ্রার মূল্য হ্রাস করুন—এরকমের যত খুশি সংস্কার আপনি করুন, কিন্তু সেই জীর্ণ দেওয়াল এই ছিটে ফোঁটা সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। একে ভেঙে ফেলে নূতন করে গড়ে তুলতে হবে।

জগৎ আদিকাল থেকে লক্ষ্মীর পূজা করে আসছে। যার উপর তিনি প্রসন্ন হন তার ভাগ্য ফিরে যায়, তার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু জগতের যত ক্ষতি লক্ষ্মী করেছেন শয়তান (Satan) তত করেনি। তিনি দেবী নন, ডাইনি।

সম্পত্তি মানুষকে তার ক্রীতদাস বানিয়েছে। তার সমস্ত মানসিক আত্মিক এবং দৈহিক শক্তি কেবল সম্পত্তির সঞ্চয়ে ব্যয়িত হয়। মরার সময় পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এই বাসনা থাকে যে হায়, এই সম্পত্তির কি হবে। আমরা সম্পত্তির জন্য জীবনধারণ করি, তারি জন্য মরি, সম্পত্তির জন্য গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করি। সম্পত্তির জন্য ঘিয়ে আলু মিশিয়ে কেন বিক্রি করি? দুধে জল কেন মেশাই? নানা প্রকারের বৈজ্ঞানিক হিংসা-যন্ত্র কেন তৈরি করি? বেশ্যা কেন হয়, ডাকাতি কেন হয়? এর একমাত্র কারণ হল সম্পত্তি। যতদিন সম্পত্তিহীন সমাজ সংগঠিত না হবে ততদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি শেষ হবে না; জগতে শান্তি আসবে না।

কিছু লোক সমাজের এই আদর্শকে শ্রেণীবাদ বা শ্রেণী সংগ্রাম 'ক্লাস ওয়ার' বলে নিজের মনে তার একটি ভয়ংকর রূপ খাড়া করে নিয়ে থাকেন। যাদের সম্পত্তি আছে, যারা লক্ষ্মীপুত্র, যারা বড় বড় কোম্পানির মালিক তারা একে ভূত মনে করে চোখ বন্ধ করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠেন। কিন্তু শান্ত মনে দেখলে তো সম্পত্তিহীনতার শরণে তারাও সেই শান্তি ও বিশ্রাম পাবেন যার জন্য তারা সন্ত ও সন্ন্যাসীদের সেবা করে থাকেন এবং তা সত্ত্বেও তা পান না। যদি তারা তাদের অতীতের কার্যাবলীকে স্মরণ করেন তাহলে জানা যাবে যে সম্পত্তি সংগ্রহ করার জন্য তারা তাদের আত্মার, নিজের সম্মানের, নিজের নীতিকে হত্যা করেছেন। নিঃসন্দেহে তাদের কাছে কোটি কোটি টাকার বিভূতি রয়েছে তবুও তারা শান্তি পাচ্ছেন না! তারা কি আপন ভাই ও স্ত্রীর সম্বন্ধেও সন্ত্রস্ত নন? তারা কি নিজের ছায়া দেখে চমকে ওঠেন না? এই কোটি কোটি টাকার পাহাড় তাদের

কোন কাজে আসে? তারা কুম্ভকর্ণের পেট নিয়েও এই পাহাড়কে তার মধ্যে ভরতে পারেন না। দৈহিক ভোগেরও সীমা আছে। তাদের কাছে কোটি টাকা আছে এর আত্মতৃপ্তি ছাড়া তো তাদের আর কোনো সুখ নেই। এমন সমাজে থাকা তাদের পক্ষে কি অসহ্য হবে যেখানে তাদের কোনো শত্রু থাকবে না, যেখানে তাদের কারো সম্মুখে কাকুতি মিনতি করতে হবে না, যেখানে ছল-কপটপূর্ণ ব্যবহার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, যেখানে তাদের কুটুম্বরা তাদের মরার পথ চেয়ে থাকবেন না, যেখানে তারা বিষের ভয় ছাড়াই ভোজন করতে পারবেন? এই অবস্থা কি তাদের অসহ্য হবে? তারা কি সেই বিশ্বাস, প্রেম ও সহযোগিতার জগৎ থেকে এত বিচলিত হন যেখানে তারা নির্দ্বন্দ্ব ও নির্ভরযোগ্য সমষ্টির সঙ্গে মিলে-মিশে জীবনযাপন করবেন? একথা ঠিক যে তাদের বড় বড় মহল এবং চাকর-বাকর ও হাতীঘোড়া থাকবে না, কিন্তু এই চিন্তা, সন্দেহ ও সংঘাতও তো থাকবে না।

কিছু লোকের সন্দেহ হয় যে ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া মানুষের পরিচালক শক্তি কোথা থেকে আসবে। তারপর বিদ্যা, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি কেমন করে হবে? গোস্বামী তুলসীদাস কি এইজন্য রামায়ণ লিখেছিলেন যে তিনি রয়াল্‌টি পাবেন? আজও আমরা হাজার হাজার লোককে দেখি যারা উপদেশক, কবি, শিক্ষক, এইজন্য যে একাজে তারা মানসিক শান্তি পান। এখন পর্যন্ত আমরা ব্যক্তির পরিস্থিতি থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারি না, সেইজন্য এরূপ আশঙ্কাগুলি আমাদের মনে দেখা দেয়, সমষ্টির কল্পনার উদয় হলেই এই স্বার্থ চেতনা আপনা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছু লোকের ভয় যে তখন আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমরা বলি যে আজ এমন কোন রাজা-ধনী আছে যে মাঝরাত্রি পর্যন্ত বসে মাথা ঘামায় না। এখানে সেই বিলাসীদের কথা বলছি না যারা বাপ-দাদার উপার্জিত সম্পত্তি ওড়াচ্ছে। তারা তো পতনের দিকে যাচ্ছে। যে মানুষ সাফল্য লাভ করতে চায় যে কোনো কাজেই হোক না কেন তাকে পরিশ্রম করতে হবে। এখন সে নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্য পরিশ্রম করে, তখন কি সমষ্টির জন্য পরিশ্রম করতে তার কষ্ট হবে?

২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩

সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি

সাম্প্রদায়িকতা সর্বদাই সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে থাকে। সে নিজের আসল রূপে সামনে আসতে বোধ হয় লজ্জা পায়। গাধা যেমন সিংহ চর্মাবৃত হয়ে জঙ্গলের পশুদের ওপর দাপট দেখিয়ে বেড়ায়, সাম্প্রদায়িকতাও সেইরকম সংস্কৃতির আবরণ ধারণ করে আসে। হিন্দু তার সংস্কৃতি প্রলয়ের দিন পর্যন্ত নিরাপদ রাখতে চায়, মুসলমানও চায় তার সংস্কৃতিকেও। উভয়েই তাদের সংস্কৃতিকে এখন পর্যন্ত অকলুষিত মনে করছে। তারা একথা ভুলে গিয়েছে যে এখন কোথাও না আছে মুসলিম সংস্কৃতি আর না আছে হিন্দু সংস্কৃতি, না কোনো অন্য সংস্কৃতি। এখন জগতে কেবলমাত্র একটি সংস্কৃতি আছে আর সেটি আর্থিক সংস্কৃতি। আমরা আজও হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির বিলাপ করে চলেছি যদিও সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। আর্য সংস্কৃতি আছে, ইরাণী সংস্কৃতি আছে আরব সংস্কৃতি, কিন্তু খ্রীস্টান সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতি নামে কোন বস্তু নেই। হিন্দু মূর্তিপূজক, তাহলে কি মুসলমান কবরপূজক নয়? তাজিয়াকে শরবত ও সিন্নী কে দেয়? মসজিদকে খোদার ঘর বলে কে মানে? যদি মুসলমানদের মধ্যে এমন সম্প্রদায় থাকে যে বড় বড় পয়গম্বরের সামনে মাথা নত করাকে কুফ্র (পাপ) মনে করে, হিন্দুদের মধ্যেও এমন সম্প্রদায় আছে যে দেবতাদের পাথরের টুকরো ও নদীগুলিকে জলের ধারা আর ধর্মগ্রন্থগুলিকে আঁষাঢ়ে গপ্প বলে মনে করে। এখানে আমরা দুই 'সংস্কৃতির' মধ্যে কোনো তফাৎ দেখতে পাচ্ছি না।

তাহলে কি ভাষার তফাৎ আছে? আদৌ নয়। মুসলমান উর্দুকে ধর্মের ভাষা বলুক কিন্তু দক্ষিণী মুসলমানের কাছে উর্দু সেই প্রকার অপরিচিত বস্তু, যেমন দক্ষিণী হিন্দুর কাছে সংস্কৃত। হিন্দু ও মুসলমান যে প্রদেশে বাস করেন, সর্বসাধারণের ভাষায় কথা বলেন তার ভাষা উর্দু বা হিন্দী, বাঙলা হোক বা মারাঠি। বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর মতই উর্দু বলতে ও বুঝতে পারে না, উভয়েই এক ভাষায় কথা বলে। সীমান্ত প্রদেশের হিন্দু সেই রকম পুশ্তু ভাষায় কথা বলে যেমন সেখানকার মুসলমান বলে।

তাহলে কি পোশাকে তফাৎ আছে? সীমান্ত প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানকে আপনার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে পোশাকে কোন তফাৎ দেখতে পাবেন না। হিন্দু স্ত্রীপুরুষও মুসলমানদের মতো সালওয়ার পরে, হিন্দু স্ত্রীলোক মুসলমান স্ত্রীলোকের মতো কুর্তা ও ওড়নি পরে ও মাথায় দেয়। হিন্দু পুরুষও মুসলমানদের মতো কুলাহ ও পাগড়ি বাঁধে। বহু ক্ষেত্রে উভয়েই দাড়ি রাখে। বাংলা দেশে হিন্দু মুসলমান মহিলারা শাড়ি পরে, হিন্দু ও মুসলমান পুরুষ উভয়েই ধুতি ও জামা পরে। লুঙ্গী পরার প্রথা খুব হালে চলেছে যখন থেকে সাম্প্রদায়িকতা প্রবল আকার নিয়েছে।

খাওয়া দাওয়াতে ধরুন। যদি মুসলমানরা মাংস খায় তো শতকরা আশিজন হিন্দুও মাংস খায়। উঁচু শ্রেণীর হিন্দুরাও মদ খায়, উঁচু শ্রেণীর মুসলমানরাও। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা মদ খায়, নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানরাও। মধ্যবিত্ত হিন্দু হয় খুব কম মদ খায়, না হয় সিদ্ধি খায় যার নেতা আমাদের পাণ্ডা পূজারী শ্রেণী। মধ্যবিত্ত মুসলমানরাও খুব কমই মদ খায়। হ্যাঁ, কিছু লোক আফিমের নেশা করে। কিন্তু এই নেশায় হিন্দু ভাইরা মুসলমানদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। হাঁা, মুসলমানরা গোরুর কুরবানি করে ও তার মাংস খায়, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও এমন জাত আছে যারা গোমাংস খায়, এমন কি মরা গোরুর মাংসও বাদ দেয় না। যদিও বধ করা ও মরা মাংসে কোনও তফাৎ নেই। সারা বিশ্বে হিন্দুই এমন এক জাতি যে গোমাংসকে অখাদ্য বা অপবিত্র মনে করে। তাহলে কি হিন্দুদের সমস্ত জগতের সঙ্গে ধর্ম-সংগ্রাম শুরু করে দিতে হবে?

সংগীত ও চিত্রকলাতেও সাংস্কৃতিক প্রভেদ পাই না। একই রাগরাগিণী উভয়েই গায় ও মুগল যুগের চিত্রকলার সঙ্গে আমরা পরিচিত। নাট্যকলা পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে না থাকুক আজ কিন্তু এই বিভাগেও আমরা মুসলমানদের দেখতে পাই যেমন হিন্দুদের।

এরপর আমরা বুঝতে পারি না যে সে কোন সংস্কৃতি যার রক্ষার জন্য সাম্প্রদায়িকতা এত তোড়জোড় করছে। বাস্তবে সংস্কৃতির গলাবাজি ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয় আর এর জন্মদাতা তারাই যারা সাম্প্রদায়িকতার শীতল ছায়ায় বসবাস করে। এটি সাদামাটা লোকদের সাম্প্রদায়িকতার দিকে টেনে আনার একটি মন্ত্র, আর কিছু নয়। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির রক্ষক সেই সব মহানুভবরা ও সেই সব সম্প্রদায় যাদের নিজের উপর, নিজের দেশবাসীদের

উপর ও সত্যের উপর ভরসা নেই। সেইজন্য চিরকালের জন্য এমন এক শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা তাদের ঝগড়ায় সালিশী করতে পারে। এই সংস্থাগুলির জনগণের সুখ-দুঃখ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই, তাদের কাছে কোনো সামাজিক ও রাজনীতিক কার্যক্রমও নেই যা তারা জাতির সামনে রাখতে পারে। তাদের একমাত্র কাজ পরস্পরের বিরোধিতা করে সরকারের কাছে অভিযোগ পেশ করা ও এই প্রকারে বিদেশী শাসনকে স্থায়ী করা। তাদের কাছে কোনো হিন্দু বা কোনো মুসলমান শাসন অপেক্ষা বিদেশী শাসন অনেক বেশি সহনীয়। তারপরও বিশেষ সুবিধের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণের শাসনের ব্যাপারে শাসকদের সহায়ক হওয়া ছাড়া আর কিছু করে না। শাসকদের ধরাধরি করে যদি মুসলমানরা কিছু সুবিধে পেয়ে যায় তাহলে কেন হিন্দুরা শাসকদের ধরাধরি করবে না এবং মুসলমানদের মতো সাফল্য লাভ করবে না? এই তাদের মনোবৃত্তি। এমন কোন কাজ খুঁজে বার করা যাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে এক হয়ে দেশকে উদ্ধার করতে পারে তা তাদের চিন্তাশক্তির নাগালের বাইরে। উভয় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানই মধ্যবিত্ত ধনিক, জমিদার, অফিসার ও পদলোলুপদের। তাদের কার্যক্ষেত্র নিজের সম্প্রদায়ের জন্য এমন সুযোগ হাসিল করা যাতে তারা জনগণের উপর শাসন করতে পারে, জনগণের উপর আর্থনীতিক ও ব্যবসায়িক প্রভুত্ব করতে পারে। জনসাধারণের সুখ দুঃখের তারা ধার ধারে না। যদি সরকারের কোনো নীতির ফলে জনসাধারণের কিছু লাভ হবার আশা থাকে কিন্তু তার জন্য এই সম্প্রদায়ের কিছু ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তার বিরোধিতা করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

যদি কিছু আরো তলিয়ে দেখা যায় তা হলে এই সংস্থার অধিক সংখ্যক এমন ভদ্রলোক আছেন যাঁদের কোনো না কোনো ভাবে নিজের স্বার্থ এতে জড়িয়ে আছে। আর কিছু না হোক শাসকের বাংলোগুলিতে তাদের যাওয়া আসা সহজ হয়ে যায়। একটি বিচিত্র কথা এই যে অফিসাররা এই ভদ্রলোকদের সম্মান করেন। এঁদের তারা বড় আদর যত্ন করেন। এছাড়া এর আর কি কারণ থাকতে পারে যে, তাঁরা মনে করেন এইসব লোকেদের ওপরই তাদের প্রভুত্ব টিকে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে খুব লড়াই কর, একে অপরের ক্ষতি করো, তাদের কাছে নালিশ কর, তাহলে তাদের ভাবনা কি, তারা অমর। মজার কথা এই যে কেউ কেউ এই ভণ্ডামি প্রচার করতে শুরু করেছে যে হিন্দুরা তাদের নিজের শক্তিতেই স্বরাজ পেতে পারে। ইতিহাস থেকে এর উদাহরণ দেওয়া হয়। এই

ধরনের ভুল ধারণা প্রচার করে মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়ানো ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না।

এমন কোনো যুগ যদি থাকে যখন মুসলমানদের রাজত্বকালে হিন্দুরা স্বাধীনতা পেয়েছিল তাহলে এমন যুগও ছিল যখন হিন্দুদের আমলেও মুসলমানরা আপন সাম্রাজ্য স্থাপিত করেছিল। সেই যুগগুলিকে ভুলে যান। সেইদিন শুভদিন হবে যখন আমাদের স্কুলগুলি থেকে এই ইতিহাস তুলে দেওয়া হবে। এযুগ সাম্প্রদায়িক অভ্যুদয়ের নয়; এটা আর্থিক যুগ এবং আজ সেই নীতি সফল হবে যাতে জনগণ তাদের আর্থনীতিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে, যাতে এই অন্ধবিশ্বাস, ধর্মের নামে এই ভণ্ডামি, নীতির নামে গরিবদের শোষণের এই প্রথা শেষ হবে। জীবনের আজ সংস্কৃতিগুলির রক্ষা করার অবকাশ নেই, আবশ্যকতা নেই। সংস্কৃতি ধনীদের, ভরপেটদের, নিশ্চিন্তদের বিলাস। গরিবদের প্রাণ রক্ষাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। সেই সংস্কৃতিতে কি-ই বা আছে, যা তারা রক্ষা করবে? জনগণ যখন মোহাচ্ছন্ন ছিল তখন ধর্ম ও সংস্কৃতির মোহ তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। যেমন তার চেতনা জাগ্রত হচ্ছে, সে দেখতে পাচ্ছে যে সেই সংস্কৃতি স্রেফ লুঠেরাদের সংস্কৃতি। যারা রাজা হয়ে, বিদ্বান হয়ে, জগৎশেঠ হয়ে জনগণকে লুঠ করে। তারা আজ আপন জীবন রক্ষার চিন্তা সর্বাধিক, যা সংস্কৃতি রক্ষার চেয়ে বেশি প্রয়োজন। সেই পুরানো সংস্কৃতির প্রতি তার মোহের কারণ নেই। আর সাম্প্রদায়িকতা তার আর্থনীতিক সমস্যার দিকে চোখ বন্ধ করে এমন কার্যক্রম নিয়ে চলছে যাতে তার (জনগণের) পরাধীনতা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

ভদ্রমহোদয়গণ,

এই সম্মেলন আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের সম্মেলন ও সংগঠনে এখন পর্যন্ত সাধারণত: ভাষা ও তার প্রচারের বিষয়ে আলোচনা হয়ে এসেছে। এমন কি উর্দু ও হিন্দীর গোড়ার দিকের যে-সাহিত্য বর্তমান তার উদ্দেশ্য চিন্তা-ধারা ও ভাবকে প্রভাবিত করা নয়, কেবল মাত্র ভাষা তৈরি করা। সেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। যতক্ষণ ভাষা একটি স্থায়ী রূপ না নেয় চিন্তা ও ভাবগুলিকে ব্যক্ত করার শক্তি কোথা থেকে আসবে? আমাদের ভাষার পথিকৃৎরা হিন্দুস্থানী ভাষা তৈরি করে জাতির যে উপকার করেছেন, তার জন্য আমরা তাদের নিকট কৃতজ্ঞ না হলে এটা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা হবে।

ভাষা হল পথ (নিমিত্ত), লক্ষ্য নয়। এখন আমাদের ভাষা সেই রূপ পেয়েছে যাতে আমরা ভাষা থেকে এগিয়ে ভাবের দিকে নজর দিতে পারি এবং এই কথা চিন্তা করি যে, যে-উদ্দেশ্যে এই গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করা হয়েছিল, তা কি করে পূরণ হবে। সেই ভাষা যার গোড়ার দিকে 'বাগোবাহার' ও 'বৈতাল পচ্চীসী'র (বেতাল পঞ্চবিংশতি) রচনাই সব চেয়ে বড় সাহিত্য ছিল, সেটা এখন এমন উপযুক্ত হয়ে উঠেছে যে, তাতে শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রশ্ন বিবেচনা করা যেতে পারে এবং আমাদের সম্মেলন এই বাস্তব অবস্থার স্পষ্ট স্বীকৃতি।

ভাষা কথোপকথনেরও হয় এবং সাহিত্যেরও হয়। কথোপকথনেরও ভাষা তো মীর অম্মনই লল্লুলালের যুগেও ছিল কিন্তু তারা যে ভাষার ভিত্তি স্থাপন করলেন সেটা ছিল লেখার ভাষা এবং সেটাই হল সাহিত্য। কথাবার্তায় আমরা কাছের লোককে নিজের কথা প্রকাশ করি, নিজের সুখ দুঃখের চিত্র তুলে ধরতে পারি। সাহিত্যিক এই কাজই লেখনীর দ্বারা করে। হ্যাঁ, তার শ্রোতার পরিধি অনেক বিস্তৃত। যদি তার কথায় সত্য থাকে তা হলে শতাব্দী ও যুগ যুগ ধরে তার রচনাবলী হৃদয়কে প্রভাবান্বিত করে।

কিন্তু আমার অভিপ্রায় এ নয় যে, যা কিছু লেখা হয়, তার সবটাই সাহিত্য। সাহিত্য সেই রচনাকেই বলা হবে যার ভিতর কোন সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যার ভাষা পোক্ত, পরিমার্জিত এবং সুন্দর এবং যার হৃদয় ও মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার গুন আছে। সাহিত্যে এই গুণ সেই অবস্থায় পূর্ণরূপে দেখা যায় যখন তাতে জীবনের সত্য ও অনুভূতি ব্যক্ত হয়। অলৌকিক (তিলিস্মাতী) গল্পে, ভূত-প্রেতের কাহিনী ও বিরহ-মিলনের আখ্যানের দ্বারা এক কালে আমরা প্রভাবিত হয়েছি। কিন্তু এখন ঐগুলিতে আমাদের রুচি খুবই কম। সন্দেহ নেই যে, মানব প্রকৃতির মরমী সাহিত্যিক রাজকুমারদের প্রেমগাথা ও অলৌকিক কাহিনীগুলিতেও জীবনের সত্যের বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু এখানেও এই কথা প্রমাণিত হয় যে, প্রভাব বিস্তারে সাহিত্যের জীবনের যথার্থ দর্পন হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় আপনি তাকে যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারেন—সে পাখির গল্প, কি ফুল ও বুলবুলের কাহিনীই হোক, এ-সবের জন্য তা উপযুক্ত হতে পারে।

সাহিত্যের অনেকগুলি পরিভাষা করা হয়েছে কিন্তু আমার মতে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট পরিভাষা হল জীবনের সমালোচনা। প্রবন্ধ রূপে হোক, আর গল্প বা কাব্যের রূপে হোক, তা আমাদের জীবনের সমালোচনা ও ব্যাখ্যা করবে।

আমরা সাহিত্যের যে যুগকে সবে পেরিয়ে এসেছি, তার জীবনের সঙ্গে কোনো সংস্পর্শ ছিল না। আমাদের সাহিত্যিকরা কল্পনার জগৎ খাড়া করে তাতে যথেচ্ছ অলৌকিক কাহিনীর (জাল) বুনে গেছেন। কোথাও 'ফিসানয়ে অজায়েরের' কাহিনী ছিল, কোথাও 'বোস্তানে খয়ালের' আর কোথাও 'চন্দ্রকান্তা-সন্ততি'র। এই আখ্যানগুলির উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র চিত্তবিনোদন ও আমাদের অদ্ভুত প্রেম-রসের তৃপ্তি। সাহিত্যের জীবনের সঙ্গে কোনো সংযোগ আছে তা ছিল কল্পনাতীত। গল্প গল্প, জীবন জীবন, দুটোকে পরস্পর বিরোধী মনে করা হতো। কবিরাও ব্যক্তিত্ববাদে ডুবে ছিলেন। প্রেমের আদর্শ ছিল ভোগলালসার তৃপ্তি, সৌন্দর্যের কাজ ছিল চোখকে তৃপ্ত করা। এই ভোগবিলাসী ভাবগুলিকে প্রকাশ করায় কবিকুল নিজের প্রতিভা ও কল্পনার চমৎকারিত্ব দেখাত। পদ্যে কোনো নূতন শব্দ-যোজনা, নূতন কল্পনার বিকাশ বাহবা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল—সে বাস্তব থেকে যতই দূর হোক না কেন। পাখির বাসা এবং পাখির খাঁচা, বিদ্যুৎ

(বর্ক) এবং খোলেনের (খিরমন) কল্পনা, বিরহের বর্ণনায় নিরাশা ও ও বেদনার নানান অবস্থা এমন ভাবে ব্যক্ত হতো যে, কবিতা কত জনপ্রিয় হতো আমরা ও আপনি খুব ভালভাবেই জানি।

নিঃসন্দেহে কাব্য ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য আমাদের অনুভূতির তীব্রতাকে বাড়ানো। কিন্তু মানুষের জীবন কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের জীবন নয়। যে-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ভোগবিলাসের মানসিকতা ও তার সঙ্গে বিরহ-নিরাশা প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যাতে জগৎ ও জগতের থেকে দূরে পালানোকেই জীবনের সার্থকতা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে তা কি আমাদের যুক্তি ও ভাবনাচিন্তার চাহিদা মেটাতে পারে? ভোগলালসার মনোভাব মানব জীবনের একটি অঙ্গ মাত্র আর যে-সাহিত্যের অধিকাংশ এর সঙ্গেই সম্পৃক্ত তা সেই জাতি ও সেই যুগের পক্ষে গর্বের বস্তু হতে পারে না এবং সেটা এর সুরুচির প্রমাণও নয়।

হিন্দী আর উর্দু কবিতার অবস্থা একই ছিল। তখনকার দিনে সাহিত্য ও কাব্য সম্বন্ধে যে জনরুচি ছিল, তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সহজ ছিল না। প্রশংসা ও কদরের বাসনা প্রত্যেকেরই হয়। কবিদের পক্ষে তাদের রচনা জীবিকার উপায় ছিল এবং কবিতার কদর অভিজাত ও আমির ছাড়া কে করবে? আমাদের কবিদের সাধারণ জীবনের সম্মুখীন হবার ও তার বাস্তবতায় প্রভাবান্বিত হবার অবসরই ছিল না, আর তাই প্রত্যেকটি ছোট বড় কবির এমন মানসিক অধঃপতন হয়েছিল যে মানসিক ও মননশীল জীবন বলে কিছুই ছিল না।

আমরা এই দোষ সেই সময়কার সাহিত্যিকদের কাঁধে চাপাতে পারি না। সাহিত্য তার সময়ের প্রতিবিম্ব। যে ভাব ও চিন্তা লোকের হৃদয়কে স্পন্দিত করে, সেইগুলোই তাদের ছায়া সাহিত্যের ওপর ফেলে। এমন অধঃপতনের সময় লোকে হয় প্রেমাসক্ত হয় বা অধ্যাত্ম ও বৈরাগ্যে মনোনিবেশ করে। জগতের নশ্বরতা যখন সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করে ও তার এক একটি শব্দ বৈরাগ্যে ডুবে থাকে, সময়ের প্রতিকূলতার অনুযোগে ভারাক্রান্ত ও ভোগলালসার ভাবের প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়ায় তা হলে বুঝে নেবেন যে, জাতি জড়তা ও অধোগতির কবলে পড়েছে, তার মধ্যে উদ্যোগ ও সংগ্রামের শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। তার মধ্যে উচ্চ (?) ও তার ভেতর দিয়ে দুনিয়াকে দেখার ও বোঝার শক্তি লোপ পেয়েছে।

কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক রুচি খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সাহিত্য এখন আর চিত্ত বিনোদনের বস্তু নয়. আমোদ-প্রমোদ ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। এখন তা কেবল নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলনের কাহিনীই শোনায় না, জীবনের সমস্যাগুলির কথাও চিন্তা করে; এবং সেগুলির সমাধান করে। এখন তা স্ফূর্তি ও প্রেরণার জন্য অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক ঘটনা খুঁজে বেড়ায় না আর অনুপ্রাসেরও অন্বেষণ করে না। তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেই প্রশ্নগুলির দিকে যা সমাজ বা ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করে। তার উৎকৃষ্টতার বর্তমান মাপকাঠি হল সেই তীব্রতা যা আমাদের ভাব ও চিন্তা-গুলিতে গতি সঞ্চার করে।

নীতিশাস্ত্র ও সাহিত্যশাস্ত্রের লক্ষ্য একই, কেবল উপদেশের পদ্ধতিতে পার্থক্য। নীতিশাস্ত্র যুক্তি ও উপদেশের দ্বারা বুদ্ধি ও মনের ওপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে। সাহিত্য তার নিজের জন্য মানসিক অবস্থা ও ভাবের ক্ষেত্রটি বেছে নিয়েছে। জীবনে আমরা যা কিছু দেখি বা যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটে, সেই অভিজ্ঞতা ও সেই আঘাতগুলি কল্পনায় প্রতিফলিত হয়ে সাহিত্য সৃজন করার প্রেরণা যোগায়। কবি ও সাহিত্যিকের মধ্যে অনুভূতি যতই তীব্র হয়, তার রচনা ততই চিত্তাকর্ষক ও উচ্চ শ্রেণীর হয়। যে সাহিত্যে আমাদের সুরুচির উদ্ভব না হয়, আধ্যাত্মিক ও মানসিক তৃপ্তি না দেয়, আমাদের মধ্যে শক্তি ও গতি সঞ্চার না করে, আমাদের সৌন্দর্য বোধ না জাগ্রত করে, যা আমাদের মধ্যে যথার্থ সঙ্কল্প ও বাধাগুলিকে জয় করার সত্যকার দৃঢ়তা না সৃষ্টি করে তা আজ আমাদের পক্ষে বৃথা। তা সাহিত্য পদবাচ্য হবার অধিকারী নয়।

পুরোনো যুগে সমাজের লাগাম ধর্মের মুঠোয় ছিল। মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সভ্যতার ভিত্তি ছিল ধর্মের নির্দেশ এবং সে ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে কাজ হাসিল করত, পাপ পুণ্যের বিচার তার উপায় (instrument) ছিল।

এখন সাহিত্য এই কাজ তার নিজ হাতে নিয়েছে। তার উপায় হল সৌন্দর্য-প্রেম। সে মানুষের মধ্যে এই প্রেমকে জাগাবার চেষ্টা করে। এমন কোন মানুষ নেই যার মধ্যে সৌন্দর্যের অনুভূতি নেই। সাহিত্যিকের মধ্যে এই বৃত্তি যতই জাগ্রত ও সক্রিয় হয়, তার রচনা ততই ফলপ্রসূ হয়। প্রকৃতি নিরীক্ষণ ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতার দৌলতে তার সৌন্দর্যবোধে এত

তীব্রতা এসে যায় যে, যা কিছু অসুন্দর, অভদ্র, মনুষ্যতা রহিত, তা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। সে শব্দ ও ভাবের সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রমণ করে। এই কথা এভাবেও বলা যায় যে, সে মানবতা, সভ্যতা ও ভদ্রতার অস্ত্র ধারণ করে। যারা দলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, তারা ব্যক্তি হোক, সমষ্টি হোক, তাদের সমর্থন করা ও তাদের ওকালতি করা তার কর্তব্য। তার আদালত হল সমাজ, এই আদালতের সামনে সে তার অভিযোগ পেশ করে এবং তার ন্যায়-বৃত্তিকে জাগ্রত করে আপন প্রচেষ্টাকে সফল মনে করে।

কিন্তু সাধারণ উকিলের মতো সাহিত্যিক তার মক্কেলের তরফ থেকে উচিত অনুচিত সব রকমের অভিযোগ পেশ করে না, অতিরঞ্জন সে করে না, নিজের তরফ থেকে সে কথা বানায় না। সে জানে যে, এই যুক্তিগুলি দিয়ে সে সমাজের আদালতকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। সেই আদালতের হৃদয় পরিবর্তন তখনই সম্ভব, যদি আপনি সত্য থেকে কিঞ্চিৎ মাত্র বিমুখ না হন। না হলে আদালতের ধারণা আপনার প্রতি বিমুখ হবে এবং সে আপনার বিরুদ্ধে রায় শুনিয়ে দেবে। সে গল্প লেখে কিন্তু বাস্তবকে মনে রেখে, মূর্তি তৈরি করে কিন্তু এমন মূর্তি যা জীবন্ত ও ভাবব্যঞ্জনা পূর্ণ। সে মানব-প্রকৃতিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে, সে মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করে এবং এই চেষ্টা করে যাতে তার পাত্ররা প্রত্যেকটি অবস্থায় ও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এমন আচরণ করে যে-আচরণ রক্ত-মাংসের মানুষে করে থাকে। নিজের সহজ সহানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধের দরুন জীবনের সেই সূক্ষ্মস্থানে গিয়ে সে পৌঁছায় যেখানে মানুষ তার সাধারণ দৃষ্টি ও বোধে পৌঁছাতে অসমর্থ।

আধুনিক সাহিত্যে বাস্তব পরিস্থিতি চিত্রণের প্রবৃত্তি এত বেড়ে যাচ্ছে যে আজকের গল্প পারতপক্ষে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমা থেকে বাইরে যায় না। আমরা কেবল এই ভেবে সন্তোষ লাভ করতে পারি না যে, মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে সব চরিত্রগুলির মানুষের সঙ্গে মিল আছে। উপরন্তু আমরা এ বিষয়ে আশ্বস্ত হতে চাই যে তারা সত্যিই মানুষ; এবং লেখক যথা সম্ভব তাদের জীবনের কথাই লিখেছে, কারণ কল্পনায় গড়া মানুষে আমাদের বিশ্বাস নেই। তাদের কাজের ও চিন্তার দ্বারা আমরা প্রভাবান্বিত হই না। আমাদের এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, লেখক যে সৃষ্টি করেছে তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই করা হয়েছে এবং তার চরিত্রদের কথা সে নিজেই বলছে।

এইজন্য কিছু সমালোচক সাহিত্যকে লেখকের আত্মচরিত বলেছেন। একই ঘটনা বা পরিস্থিতির দ্বারা সব মানুষ সমানভাবে প্রভাবান্বিত হয় না। প্রত্যেক মানুষের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিকোণ পৃথক। রচনা কৌশল এই যে, লেখক যে মনোবৃত্তি বা দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো কিছু দেখে পাঠক তাতে তার সঙ্গে যেন একমত হতে পারে। এই হল তার সাফল্য। এরই সঙ্গে সাহিত্যিকের কাছে আমরা আশা করি যে, সে নিজের জ্ঞানসত্তার চিন্তা-ধারার ও বিস্তৃতির দ্বারা আমাদের জাগ্রত করুক। আমাদের দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম, এত গভীর ও এত বিস্তৃত হোক যে তার রচনায় আমরা যেন আধ্যাত্মিক আনন্দ ও বল পাই। সংস্কারের যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তার চেয়ে ভাল অবস্থায় আসার প্রেরণা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতাগুলি আছে, সেগুলি রোগের মতো আমাদের জড়িয়ে আছে। যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার এবং রোগ ঠিক এর উল্টো, সেই রকম নৈতিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও প্রাকৃতিক ব্যাপার এবং আমরা মানসিক তথা নৈতিক পতনে সেই রকম সন্তুষ্ট থাকতে পারি না যেমন কোনো রোগী তার রুগ্ন অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। যেমন সে সর্বদা কোনো চিকিৎসকের সন্ধানে থাকে, সেই রকম আমরাও এই চিন্তায় থাকি, যে কোনো উপায়ে নিজের দুর্বলতাগুলিকে দূরে ফেলে দিয়ে আরো ভাল মানুষ হতে পারি। এইজন্য আমরা সাধু-ফকিরের সন্ধানে থাকি, পূজা পাঠ করি, বয়োবৃদ্ধদের কাছে বসি, বিদ্বানদের ভাষণ শুনি আর সাহিত্য অধ্যয়ন করি।

আমাদের সমস্ত দুর্বলতার কারণ আমাদের সুরুচি ও প্রেমের অভাব। যেখানে যথার্থ সৌন্দর্য অর্থাৎ প্রেমের বিস্তৃতি আছে, সেখানে দুর্বলতা কি করে থাকবে। প্রেমই তো আধ্যাত্মিক খাদ্য এবং সমস্ত দুর্বলতাগুলি এই খাদ্য না পাওয়ার অথবা দূষিত খাদ্য পাওয়ার জন্য জন্মায়। শিল্পী আমাদের মধ্যে সৌন্দর্যের অনুভূতি ও প্রেমের উষ্ণতা উৎপন্ন করে। তার একটি বাক্য, একটি শব্দ, একটি ইঙ্গিত আমাদের অন্তরে এভাবে প্রবেশ করে যে, আমাদের অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ শিল্পী স্বয়ং সৌন্দর্যের প্রেমে আপ্লুত না হয় এবং তার আত্মা স্বয়ং এই জ্যোতির দ্বারা বিচ্ছুরিত না হয়, সে আমাদের আলোকিত করবে কি করে।

প্রশ্ন হল সৌন্দর্য বস্তুটি কি? স্পষ্টতই এই প্রশ্ন অর্থহীন মনে হয় কারণ

সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। আমরা সূর্য উঠতে ও ডুবতে দেখেছি, উষা ও সন্ধ্যার লালিমা দেখেছি, সুন্দর সুগন্ধে ভরা ফুল দেখেছি, পাখিদের মিষ্টি কাকলী শুনেছি, কল-কল নিনাদিনী নদী দেখেছি, নৃত্যগতি ঝর্ণা দেখেছি। এই হল সৌন্দর্য।

এই দৃশ্যগুলিকে দেখে আমাদের অন্তঃকরণ কেন পুলকিত হয়ে ওঠে? এই জন্য যে রঙ্গ বা ধ্বনির সামঞ্জস্য আছে। বাদ্যের স্বর-সাম্য অথবা মিলই সঙ্গীতের মুগ্ধ করার কারণ। আমাদের রচনাই উপাদানের সামঞ্জস্যের সংযোগে হয়েছে। সেই জন্য আমাদের আত্মা সর্বদা সেই সাম্য ও সামঞ্জস্যের সন্ধানে থাকে। শিল্পীর সাহিত্য আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের ব্যক্ত রূপ আর সামঞ্জস্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে না। সে আমাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা, সত্য, সহানুভূতি, ন্যায় পরায়ণ এবং মমতার ভাব সৃষ্টি করে। যেখানে এই ভাবগুলি আছে, সেখানেই দৃঢ়তা ও জীবন আছে। যেখানে এর অভাব সেখানেই বিভেদ, বিরোধ, স্বার্থপরতা আছে; দ্বেষ, শত্রুতা ও মৃত্যু আছে। এই বিচ্ছিন্নতা-বিরোধ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ জীবনের লক্ষণ। যেমন রোগ প্রকৃতি বিরুদ্ধ আহার-বিহারের চিহ্ন। যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে অনুকূলতা ও সাম্য আছে সেখানে সংকীর্ণতা ও স্বার্থের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব হবে। যখন আমাদের আত্মা প্রকৃতির মুক্ত আবহাওয়ায় লালিত-পালিত, এতে নীচতা ও দুষ্টতার কীটগুলি আপনা আপনি হাওয়া ও আলোতে মরে যায়। প্রকৃতি থেকে পৃথক হয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে নিলে এই সমস্ত মানসিক ও ভাবগত রোগ উৎপন্ন হয়ে থাকে। সাহিত্য আমাদের জীবনকে স্বাভাবিক ও স্বাধীন করে। অন্যভাবে বলা যায় তারই দৌলতে মনের সংস্কার হয়। এই হল তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমার মতে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' এই নামটি ভুল। সাহিত্যিক বা শিল্পী স্বভাবত প্রগতিশীল হয়। যদি তার এই স্বভাব না হত তা হলে সে বোধ হয় সাহিত্যিকই হত না। সে তার অন্তরে ও বাইরেও একটি অভাব অনুভব করে। এটা পূরণ করার জন্য তার আত্মা অস্থির হয়। নিজের কল্পনায় ব্যক্তি ও সমাজকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের যে অবস্থায় দেখতে চায়, তা সে দেখতে পায় না। সেইজন্য বর্তমান মানসিক ও সামাজিক অবস্থা দেখে তার হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়। সে এই অপ্রিয় অবস্থাগুলিকে শেষ করে দিতে চায় যাতে দুনিয়া জীবন-ধারণের জন্য এর চেয়ে ভাল জায়গা হয়ে উঠতে পারে। এই বেদনা

ও এই ভাব তার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে সক্রিয় করে রাখে। বেদনা ভরা তার হৃদয় সহ্য করতে পারে না যে কেন একটি গোষ্ঠী সামাজিক নিয়ম ও পরম্পরাগত নিয়মে বাঁধা পড়ে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে? এমন সামগ্রী সংগ্রহ করা যাক্ না কেন যাতে সে দাসত্ব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়ে যায়? সে এই বেদনাকে যত বিহ্বলতার সঙ্গে অনুভব করে তার রচনাতে ততই শক্তি ও সত্য জাগ্রত হয়। নিজ অনুভূতিকে যে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে, তা হল তার কলা-কুশলতার রহস্য কিন্তু বোধ হয় এই বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেওয়ার আবশ্যকতা এইজন্য যে প্রগতি বা উন্নতির অর্থ প্রত্যেক গ্রন্থকারের কাছে এক নয়। যে অবস্থাগুলিকে এক দল উন্নতি মনে করতে পারে, অন্য দল সেগুলি নিশ্চিত অবনতি মনে করতে পারে। সেইজন্য সাহিত্যিক তার শিল্পকে কোনো উদ্দেশ্যের অধীন করতে চায় না। তার মতে কলা কেবল মনোভাবের তার নিজস্ব স্বরূপে প্রকাশ করার নাম সেই ভাবগুলির ব্যক্তি ও সমাজের ওপর যে প্রভাবই পড়ুক না কেন।

উন্নতি থেকে আমরা বুঝি সেই অবস্থা যাতে আমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কর্মশক্তি জাগ্রত হয়, যাতে আমাদের মধ্যে দুঃখের অবস্থার অনুভূতি জাগে। আমরা দেখি যে, কোন কোন অন্তরের ও বাহ্য কারণে আমরা এই নির্জীব ও ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় এসে পৌঁছেছি এবং সেগুলিকে দূর করার চেষ্টা করি।

আমাদের জন্য কবিতার সেই ভাবভঙ্গিমা নিরর্থক যাতে জগতের নশ্বরতায় আধিপত্য আমাদের মনে আরো দৃঢ় হয়ে যায় যাতে আমাদের হৃদয়ে নৈরাশ্য ছেয়ে যায়। প্রেমের যে গল্পগুলিতে আমাদের মাসিক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা ভরা থাকে, আমাদের জন্য অর্থহীন যদি সেগুলি আমাদের মধ্যে গতি ও উত্তাপ উৎপন্ন না করে। আমরা যদি দুই যুবক-যুবতীর প্রেম কাহিনী বলি অথচ তাতে আমাদের উপর সৌন্দর্য-প্রেমের কোন প্রভাব না পড়ে এবং ফল হয় কেবল এইটুকুই যে আমরা তাদের বিরহ-ব্যথা নিয়ে কান্নাকাটি করি, তা হলে তাতে আমাদের মধ্যে কোন মানসিক বা রুচিগত সাড়া জাগে কি? এই কথায় কোনো সময় আমাদের ভাবাবেশ উদ্রেক হতো কিন্তু আজকের দিনে সেটা বৃথা। এই ভাবোত্তেজক কলার যুগ আর নেই। এখন আমাদের দরকার সেই কলার যা কর্মের বাণী দেয়। এখন ইকবালের সঙ্গে আমরাও বলি—

রম্‌জে হয়াত জোই জুজদর তপিশ নয়াবী,
দর কুল জুম আরমীদন নঙ্গস্ত আবে জুরা।
ব আশিয়াঁ ন নশীমন জে লজ্জতে পরবাজ,
গহে বশাখে গুলম গহে বরলবে জুয়ম।

অর্থাৎ, 'যদি তুমি জীবনের রহস্যের সন্ধানে থাক তা হলে তুমি তা সংগ্রামের পথে ছাড়া পাবে না। সমুদ্রে গিয়ে বিশ্রাম করা নদীর পক্ষে লজ্জার কথা। আনন্দের জন্য আমি (পাখি) কখনও বাসায় বসে থাকি না: কখন ফুল গাছের ডালে থাকি আর কখনও নদী তটে।'

অতএব আমাদের পন্থায় অহংবাদ বা নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য দেওয়া সেই বস্তু যা আমাদের জড়তা, পতন ও অসতর্কতার দিকে নিয়ে যায় এবং এরূপ কলা আমাদের জন্য না ব্যক্তিগত ভাবে না সমষ্টিগত ভাবে উপযোগী।

আমি একথা বলতে দ্বিধা বোধ করি না যে অন্য জিনিসের মতো আমি কলাকেও উপযোগিতার তুলাদণ্ডে মাপ করি। নিঃসন্দেহে কলার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য বৃত্তিকে বলিষ্ঠ করার আর তা' হল আমাদের আধ্যাত্মিক আনন্দের চাবিকাঠি। কিন্তু এমন কোন রুচিগত, মানসিক তথা আধ্যাত্মিক আনন্দ নেই যার কোন উপযোগিতার দিক নেই। স্বয়ং আনন্দ উপযোগিতার সঙ্গে যুক্ত একটি বস্তু এবং উপযোগিতার দৃষ্টিতে একই বস্তু থেকে আমরা সুখ পাই, দুঃখও পাই। আকাশে ছড়ানো লালিমা নিঃসন্দেহে বড় সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু আষাঢ় মাসে যদি আকাশে সেইরূপ লালিমা ছেয়ে যায় তা হলে তা আমাদের পক্ষে আনন্দদায়ক হবে না। তখন আমরা আকাশে কাল মেঘ' দেখে খুশী হই। ফুল দেখে এই জন্য আনন্দ হয় যে সেগুলি দেখে ফলের আশা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের জীবনের সুর মিলিয়ে থাকলে আমরা এই জন্য আধ্যাত্মিক সুখ পাই যে তাতে আমাদের জীবন বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়। প্রকৃতির বিধান বৃদ্ধি ও বিকাশ, আর যে ভাব, অনুভূতি ও চিন্তা থেকে আমরা আনন্দ পাই তারা এই বৃদ্ধি ও বিকাশের সহায়ক। শিল্পী তার শিল্প থেকে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে পরিস্থিতিকে বিকাশের উপযোগী করে।

কিন্তু সৌন্দর্যও অন্য পদার্থের মতো স্বয়ং সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ নয়, তার স্থিতিও আপেক্ষিক। একজন অভিজাতের যে বস্তু সুখের উপাদান, অন্যের পক্ষে তা দুঃখের কারণ হতে পারে। এক অভিজাত তার সুরভিত সুরম্য

উদ্যানে বসে যখন পাখিদের কলকাকলী শুনে স্বর্গসুখ লাভ করে তখন কিন্তু অন্য এক সচেতন ব্যক্তি বৈভবের এই সামগ্রীকে ঘৃণ্যতম বস্তু মনে করে।

বন্ধুত্ব ও সাম্য, সভ্যতা তথা প্রেম সামাজিক জীবনের প্রথম থেকেই আদর্শবাদীদের সুবর্ণ স্বপ্ন উদ্রেক করেছে। প্রবর্তকরা ধার্মিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন দিয়ে এই স্বপ্নকে স্থায়ী করার সতত কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস করেছেন। মহাত্মা বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি প্রচারক ও ধর্ম-প্রবর্তকরা নীতির ভিত্তিতে এই সাম্যের ইমারত গড়তে চেয়েছিলেন কিন্তু কেউই সফল হননি আর ছোট বড়োর প্রভেদ যেমন নিষ্ঠুর রূপে প্রকট হচ্ছে, সে রূপ বোধ হয় এর আগে কখনও হয়নি।

'পরীক্ষিৎকে পরীক্ষা করা মূর্খতা' এই প্রবাদ অনুসারে যদি আমরা এখনও ধর্ম ও নীতির আঁচল ধরে সাম্যের মহান লক্ষ্যে পৌছাতে চাই তা হলে বিফল হব। তা হলে কি আমরা এই স্বপ্নকে উত্তেজিত মস্তিষ্কের সৃষ্টি মনে করে ভুলে যাব? তাহলে তো মানুষের উন্নতি ও পরিপূর্ণতার জন্য কোনো আদর্শ বাকি থাকবে না, এর চেয়ে অনেক ভাল হবে যদি মানুষের অস্তিত্বই শেষ হয়ে যায়। আদর্শকে আমরা সভ্যতার গোড়া থেকে লালন পালন করেছি। যার জন্য ভগবান জানেন মানুষ না জানি কত আত্ম-বলিদান করেছে, যার পরিণতির জন্য ধর্মের আবির্ভাব হল। মানব সমাজের ইতিহাস যে আদর্শলাভের প্রয়াসের ইতিহাস, তাকে সসম্মানে এক অনপনেয় সত্য মনে করে আমাদের উন্নতির মাঠে নামতে হবে। আমাদের এমন এক নূতন সংগঠনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হবে, যেখানে সাম্য কেবল মাত্র নৈতিক বন্ধনে আশ্রিত না থেকে দৃঢ়তর রূপ গ্রহণ করে। আমাদের সাহিত্যকে সেই আদর্শ নিজের সামনে রাখতে হবে।

আমাদের সৌন্দর্যের মাপকাঠি বদলাতে হবে। এখন পর্যন্ত এই মাপকাঠি আমিরী ও বিলাসিতার ধরনের ছিল। আমাদের শিল্পী আমীরদের অনুগামী থাকত। তাদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল এবং তাদের সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশা, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাখ্যা শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল। তার দৃষ্টি অন্তঃপুর ও প্রাসাদের দিকে ছিল। কুটীর ও ধ্বংসস্তূপে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকারী ছিল না। সেগুলিকে সে মনুষ্যতার পরিধির বাইরে মনে করত। কখনও এগুলির কথা উল্লেখ

করলেও সেটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার জন্য করত। গ্রামবাসীদের বেশভূষা এবং তাদের চাল-চলন নিয়ে হাসি ঠাট্টা করার জন্য, তাদের কেতাদুরস্ত না হওয়া বা প্রবাদের ভুল ব্যবহার তার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের স্থায়ী উপাদান ছিল। সে মানুষ, তারও হৃদয় আছে আর তারও আকাঙ্ক্ষা আছে—তা শিল্পের কল্পনার বাইরে ছিল।

সংকীর্ণ রূপ-পূজা, শব্দ যোজনা আর ভাব-নিবন্ধনের পূর্বে নাম ছিল শিল্প এবং আজও তাই আছে। তার জন্য কোন আদর্শ ছিল না, জীবনের কোনো উচ্চ উদ্দেশ্য ছিল না—ভক্তি, বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিকতা ও জগৎ থেকে দূরে সরে থাকা ছিল তার সর্বোচ্চ কল্পনা। আমাদের শিল্পীর চিন্তায় জীবনের চরম লক্ষ্য হল এই, তার দৃষ্টি এখনো এত ব্যাপক নয় যে জীবন সংগ্রামে সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ দেখতে পায়। উপবাস ও নম্রতায়ও সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সম্ভব, একথা সে কদাচিৎ স্বীকার করে না। তার দৃষ্টিতে সৌন্দর্য ক্ষেতের একটি সুন্দর নারী—কিন্তু সেই নারী গরিব মা নয়, রূপহীনা নারী নয় যে ক্ষেতের আলে শিশু সন্তানকে শুইয়ে পরিশ্রম করে। সে ঠিক করে নিয়েছে যে রাঙ্গা ঠোঁট, কপোল ও ভ্রূতে নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যের আধার। তার জন্য জট পাকানো চুলে, শুকনো ঠোঁটে, মলিন মুখে সৌন্দর্য আসবে কোথা থেকে?

এটা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির দোষ। যদি তার সৌন্দর্য দেখার দৃষ্টিতে বিস্তার আসে সে দেখতে পাবে রাঙা ঠোঁট ও কপোলের আড়ালে রূপের গর্ব ও নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে আছে। আর শুকনো ঠোঁটে ও মলিন কপোলের অশ্রুতে ত্যাগ, শ্রদ্ধা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা রয়েছে। হ্যাঁ, তাতে চাকচিক্য নেই, জাঁকজমক নেই, সৌকুমার্য নেই।

আমাদের শিল্প যৌবনের প্রেমে পাগল। সে একথা জানে না যে যৌবন বুকে হাত রেখে কবিতা পাঠ, নায়িকার নিষ্ঠুরতার জন্য অশ্রু বিসর্জন বা রূপের গর্ব ও প্রেমের ভনিতার জন্য মাটিতে মাথা কোটায় নয়। যৌবনের নাম হল আদর্শবাদের, সাহসের, বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছা ও ত্যাগের। ইকবালের কথায় বলতে হবে—

> অজ দস্তে জনুনে মন জিব্রিল জবুঁ সৈদে,
> য়জদাঁ বকমন্দ আপর অয় হিম্মতে মরদানা।

(অর্থাৎ, আমার উন্মত্ত হাতীর কাছে গ্যাব্রিয়েল একটি তুচ্ছ শিকার।

হে সাহসী পুরুষ তুমি তোমার দড়ির ফাঁসে স্বয়ং খোদাকেই বেঁধে আন না ?)

অথবা

চূঁ মৌজ সাজে বজুদম জে সৈল বেপরওয়াস্ত,
গুর্মা মবর কিদরী বহর সাহিলে জোয়ম।

(অর্থাৎ, ঢেউয়ের মতো আমার জীবন তরীও প্রবাহ সম্বন্ধে বেপরোয়া। মনে করো না যে এই সমুদ্রে আমি কূল খুঁজছি।)

আর এই অবস্থা সেই সময় দেখা দেবে যখন আমাদের সৌন্দর্য ব্যাপক হয়ে উঠবে, যখন সমগ্র সৃষ্টি তার আওতায় এসে যাবে। এটা কোনো বিশেষ শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তার উড়ে বেড়ানোর সীমা কেবলমাত্র বাগানের চার-দেওয়ালের মধ্যে হবে না, তা হবে বায়ুমণ্ডল যা সমগ্র বিশ্বকে ঘিরে রয়েছে। তখন কুরুচি আমাদের সহ্য হবে না, তখন আমরা কোমর বেঁধে তাকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য তৈরি হব। যখন আমরা সেই ব্যবস্থাকে সহ্য করতে পারবো না যার ফলে হাজার হাজার লোক মুষ্টিমেয় অত্যাচারীর গোলামী করে। তখনই আমরা কাগজের পৃষ্ঠায় লিখে তৃপ্তি লাভ করব না এবং সেই বিধান রচনা করব যা সৌন্দর্য, সুরুচি, আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্বের বিরোধী নয়।

সাহিত্যিকের লক্ষ্য কেবলমাত্র মজলিশ সাজানো ও চিত্তবিনোদনের উপাদান জোটানো নয়, তাকে এত নিচে নামাবেন না। এটা দেশ ভক্তির ও রাজনীতির অনুগামী বাস্তবিকতা নয়, উপরন্তু তার সামনে এগিয়ে চলার আলোক শিখা।

আমরা প্রায়ই অনুযোগ করি যে সাহিত্যিকের সমাজে কোনো স্থান নেই, অর্থাৎ ভারতের সাহিত্যিকদের জন্য সমাজে কোন স্থান নেই। সভ্য দেশে সাহিত্যিক সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। বড় বড় অভিজাত ও মন্ত্রী তার সঙ্গে মিলিত হয়ে গৌরব বোধ করেন, কিন্তু ভারতবাসী তো এখনও মধ্য-যুগের অবস্থায় পড়ে আছে। যদি সাহিত্যিকরা ধনীদের অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়াকে জীবনের সহায়ক বলে মনে করে, আর সমাজে যে-আন্দোলন, তোলপাড় ও বিপ্লব ঘটছে সেই সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে আপন কান্না-হাসির জগৎ সৃষ্টি করে তা হলে জগতে তার কোনো স্থান না হওয়া অন্যায় নয়। যখন সাহিত্যিক হবার জন্য অনুকূল রুচি ছাড়া আর কোনো গুণের প্রয়োজন

নেই, যেমন মহাত্মা হবার জন্য কোনো প্রকারের শিক্ষার প্রয়োজন নেই, আধ্যাত্মিক যোগ্যতাই যথেষ্ট এর ফলে মহাত্মারা দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, সেই রকম সাহিত্যিকও লাখে লাখে দেখা দিল।

সন্দেহ নেই যে সাহিত্যিক জন্মায়, তৈরি হয় না, কিন্তু যদি আমরা শিক্ষা ও জিজ্ঞাসার দ্বারা প্রকৃতির এই অবদানকে প্রতিপালন করতে পারি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সাহিত্যের আরও সেবা করতে পারবো। যারা সাহিত্যিক হবেন তাদের জন্য আরিস্টোটল ও অন্য বিদ্বানেরা কড়া শর্ত আরোপ করেছেন। তাদের মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং ভাবগত সভ্যতা তথা শিক্ষার জন্য নিয়ম ও বিধি নিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে হিন্দীতে সাহিত্যিকের জন্য কেবল প্রবৃত্তিকে শেষ কথা বলে মনে করা হয়। সে রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হোক তবুও সে সাহিত্যিক।

সাহিত্যিকের সম্মুখে আজকাল যে আদর্শ রাখা হয়েছে সেই অনুযায়ী এই সব বিদ্যাগুলি তার অঙ্গীভূত হল আর সাহিত্য প্রবৃত্তি, অহং বা ব্যক্তি-বাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, উপরন্তু তা মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক রূপে পরিণত হয়। এখন সাহিত্য ব্যক্তিকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেখে না কিন্তু তাকে সমাজের একটি অঙ্গ হিসেবে দেখে, এইজন্য নয় যে তা' সমাজকে শাসন করতে চায়, তাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়—যেন সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে (চিরন্তন) শত্রুতা রয়েছে। কিন্তু আসলে এই জন্য যে সমাজের অস্তিত্বের উপর তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল এবং সমাজ থেকে আলাদা করে দেখলে তার মূল্য শূন্য হয়ে যায়।

আমাদের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ শিক্ষা ও মানসিক শক্তি পেয়েছেন, তাদের ওপর সমাজের প্রতি দায়িত্বও রয়েছে। আমরা সেই মানসিক পুঁজিপতিকে পূজার যোগ্য মনে করব না যারা সমাজের পয়সায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। সমাজের কাছ থেকে নিজে লাভবান হওয়ার মতো কাজে কোনো সাহিত্যিকের কখনো পছন্দ হবে না। এই মানসিক পুঁজিপতির কর্তব্য যে সে নিজের লাভের চেয়ে সমাজের লাভের দিকে বেশি নজর দেওয়া উপযুক্ত মনে করুক—নিজের বিদ্যা ও যোগ্যতার দ্বারা সমাজকে অধিকতর লাভবান করার চেষ্টা করুক। তার সেই বিভাগের সঙ্গে বিশেষ করে অন্য বিভাগের সাধারণতঃ পরিচয় হোক।

আমরা যদি আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক সম্মেলনের রিপোর্ট পড়ি তা হলে আমরা দেখব যে এমন কোন শাস্ত্রীয়, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন নেই যার আলোচনা তাতে হয় না। এর বিপরীত যখন আমরা নিজেদের জ্ঞানের সীমাকে লক্ষ্য করি তখন আমরা আমাদের অজ্ঞতায় লজ্জিত হই। আমরা ধরে নিয়েছি যে সাহিত্য রচনার জন্য উপস্থিত বুদ্ধি ও ক্ষিপ্র লেখনী যথেষ্ট কিন্তু এই চিন্তাধারাই আমাদের সাহিত্যিক অবনতির কারণ। আমাদের সাহিত্যের মাপকাঠি উন্নত করতে হবে যাতে তা সমাজের আরও মূল্যবান সেবা করতে পারে, সে যাতে সমাজে সেই পদ অধিকার করতে পারে যে পদ পাবার সে অধিকারী, যাতে সে জীবনের প্রত্যেক বিষয়ের সমালোচনা বিবেচনা করতে পারে এবং আমরা যাতে অন্য ভাষারও সাহিত্যের উচ্ছিষ্ট খেয়ে সন্তুষ্ট না হই, কিন্তু নিজের পুঁজি বাড়াই।

আমাদের নিজের রুচি ও প্রবৃত্তির অনুকূল বিষয় বেছে নিয়ে সেই বিষয় পুরাপুরি আয়ত্ত করা উচিত। আমরা যে আর্থিক ব্যবস্থায় জীবন যাপন করছি, তাতে এই কাজ নিশ্চয় কঠিন। কিন্তু আমাদের আদর্শ উঁচু হওয়া চাই, আমরা পাহাড়ের চূড়ায় যদিও নাও পৌছাতে পারি তা হলেও তার মাঝামাঝি তো পৌছাতে পারব যা জমির পড়ে থাকার চেয়ে অনেক ভাল। যদি আমাদের অন্তর প্রেমের জ্যোতির দ্বারা আলোকিত হয়, আর সেবার আদর্শ আমাদের সামনে থাকে তাহলে এমন কোনো বাধা নেই যাকে আমরা জয় করতে না পারি।

যাদের কাছে ধন-বৈভব প্রিয়, সাহিত্য-মন্দিরে তাদের জন্য স্থান নেই। এখানে দরকার সেই উপাসকদের যারা সেবাকেই তাদের জীবনের সার্থকতা বলে স্বীকার করে নিয়েছে, যাদের হৃদয়ে দরদের ব্যথা আছে ও ভালবাসার জোশ আছে। নিজের সম্মান নিজের হাতে রয়েছে। আমরা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজের সেবা করি তা হলে মান, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি আমাদের পদ চুম্বন করবে। আর সম্মান-প্রতিষ্ঠার চিন্তা আমাদের চিন্তিত করবে কেন? আর তা না পেলে আমরা নিরাশ হব কেন? সেবায় যে আধ্যাত্মিক আনন্দ আছে, তাই আমাদের পুরস্কার—আমরা সমাজকে আমাদের মহানুভবতার কথা জানাব কেন, নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা কেন আমাদের পেয়ে বসবে? অন্যদের চেয়ে বেশি আরামে থাকার ইচ্ছা

আমাদের ব্যাকুল করবে কেন? আমরা ধনীদের শ্রেণীতে নিজেদের শামিল করতে যাবো কেন? আমরা তো সমাজের পতাকা বহনকারী সৈনিক এবং সরল জীবনের সঙ্গে উচ্চ চিন্তাধারা আমাদের জীবনের লক্ষ্য। যে যথার্থ শিল্পী সে স্বার্থপর জীবন কামনা করতে পারে না। নিজের মনতুষ্টির জন্য তার নিজেকে জাহির করার প্রয়োজন নেই, এটাকে সে তো ঘৃণা করে। সে ইকবালের সুরে সুর মিলিয়ে বলে—

মর্দুম আজাদম আগুনা রাগুরম কি মরা.

মীতবাঁ (ওয়াঁ) কুস্তব একে জামে জুলালে দীগরাঁ।

(অর্থাৎ, আমি স্বাধীন ও এতই হয়াদার (লাজুক) যে আমাকে অন্যদের ব্যবহার করা জলের এক পেয়ালা জলে মারা যায়।)

আমাদের পরিষদ অনেকটা এই প্রকারের নীতি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। সাহিত্য মদ-মাংস (শরাব-কবাব) ও রাগ-রঙ্গের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকুক এটা সে পছন্দ করে না। সে তাকে উদ্যোগ ও কর্মের মঞ্চ করে তোলার দাবি করে। তার ভাষা নিয়ে তার কোনো বিবাদ নেই। আদর্শ ব্যাপক হলে ভাষা নিজে নিজেই সরল হয়ে ওঠে। ভোগবিলাস, সাজ-গোজের প্রতি ঔদাসীন্যই দেখাতে পারে। যে সাহিত্যিক ধনীদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে এইরূপ রচনা-শৈলী স্বীকার করে। যে জনসাধারণের, সে জনসাধারণের ভাষা লেখে। আমাদের উদ্দেশ্য হল দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে অভীষ্ট সাহিত্য লেখা হয় ও প্রস্ফুটিত হয়।

আমরা চাই সাহিত্য কেন্দ্রগুলিতে আমাদের পরিষদ স্থাপিত করতে যাতে সেখানে সাহিত্যের গঠনমূলক প্রবৃত্তগুলির নিয়মিত ভাবে চর্চা হোক, নিয়মগুলি পড়া হোক, তা নিয়ে বিতর্ক হোক, সমালোচনা ও বিরূপ সমালোচনা হোক। তবেই সেই পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তবেই সাহিত্যে নূতন যুগের আবির্ভাব হবে।

আমরা প্রত্যেকটি ভাষায় এমন পরিষদ স্থাপিত করতে চাই যাতে প্রতিটি ভাষায় আমাদের কথা পৌঁছে দিতে পারি। এ মনে করা ভুল হবে যে এটা আমাদের কোন নূতন কল্পনা। না, দেশের সাহিত্যসেবীদের হৃদয়ে সমষ্টিগত ভাবনা রয়েছে। ভারতের প্রত্যেকটি ভাষায় এই চিন্তাধারার বীজ প্রকৃতি ও পরিস্থিতি আগে থেকে বপন করে রেখেছে, স্থানে স্থানে তার অঙ্কুর দেখা

দিতে শুরু করেছে। তাকে সিঞ্চিত করা এবং তার লক্ষ্যকে পরিপুষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য।

আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে কর্মশক্তির অভাব। এটা অপ্রিয় সত্য। আমরা এর প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি না। এতদিন আমরা সাহিত্যের যে আদর্শ সামনে রেখেছিলুম, তার জন্য কর্মের আবশ্যকতা ছিল না। কোন এক সময় ভাবসর্বস্বতাই তার গুণ ছিল, যেহেতু কর্ম তার সঙ্গে পক্ষপাত ও সঙ্কীর্ণতাও আনে। যদি কোনো ব্যক্তি ধার্মিক হয়ে নিজের ধার্মিকতা নিয়ে গর্ব করে, তা হলে এর চেয়ে অনেক ভাল যে সে ধার্মিক না হয়ে যদি খাও দাও, ফুর্তি কর মেনে নেয়। এমন উচ্ছৃঙ্খলতাবাদী ঈশ্বরের দয়ার অধিকারী হতে পারে, কিন্তু ধর্মের ধ্বজাধারীর জন্য এর সম্ভাবনা নেই।

যাই হোক, যতদিন সাহিত্য ছিল কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনের উপকরণ, ছড়া কেটে ঘুম পাড়ানো, অশ্রুপাত করে (চোখের জল ফেলে) মন হালকা করা, ততদিন তার জন্য কর্মের প্রয়োজন ছিল না। সে ছিল এক প্রেমোন্মত্ত (দীওয়ানা) যাকে অন্যে ক্ষমা করবে কিন্তু আমরা সাহিত্যকে কেবল চিত্ত বিনোদন ও বিলাসিতার বস্তু মনে করি না। আমাদের মাপকাঠিতে সেই সাহিত্য খাঁটি প্রমাণিত হবে যাতে উচ্চ চিন্তন আছে, স্বাধীনতার ভাব আছে, সৌন্দর্যের সার আছে, সৃষ্টির আত্মা আছে, জীবনের সত্যের অভিব্যক্তি আছে, যা আমাদের মধ্যে গতি, সংকট, আকুলতার উদ্রেক করে, ঘুম পাড়ায় না, কেন না এখন আর বেশি ঘুমোনো মৃত্যুর লক্ষণ।

এপ্রিল ১৯৩৬

প্রগতি লেখক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

শর্করা সম্মেলন

সিমলায় শর্করা সম্মেলন হচ্ছে। আখ উৎপাদনকারী কৃষকদের মিল-ওয়ালাদের হাত থেকে যাতে রক্ষা করা যায় ও বিদেশী চিনির ওপর যে কর বসানো হয়েছে, তার উপকার যাতে কৃষক, মিল মালিক ও জনগণ সমান-ভাবে পায় তার জন্যই এই সম্মেলন। একজন প্রস্তাব করেছেন সরকার আখের দর বেঁধে দিক, আর একজন বলেছেন এতে কৃষকদের ক্ষতি হবে। একটি প্রস্তাব ছিল এক একটি মিলের জন্য এক একটা অঞ্চল ঠিক করে দেওয়া হোক। সেই অঞ্চলের আখ তার বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। আর একজন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। এইভাবে সম্মেলন শেষ হবে, আর কৃষকরা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যাবে, সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের দেখতে হবে সাধারণ অবস্থায় বিঘে প্রতি কৃষক কত পেত, ততটা তার পাওয়া উচিত। ধরুন সে এক বিঘে আখ চাষ করল, তাতে কুড়ি মন গুড় তৈরি হল, যার দাম একশো টাকা। এই টাকা ক্ষেতের আখ বিক্রি হয়ে গেলে তার পাওয়া চাই। অথবা এর চেয়েও ভাল উপায় হল এই যে মিলকে পারিশ্রমিক ও খানিকটা মুনাফা দিয়ে, যা শতকরা দশের বেশি কিছুতেই হবে না, যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে সেটা আখ চাষীদের পড়তা হিসেবে দেওয়া হোক এবং এর দেখাশোনা খোদ সরকার করুক।

যতদিন দেশের সুদিন আসছে না ও সব ব্যবসাগুলির জাতীয়করণ হচ্ছে না, কৃষক ও মজুরদের ভাগ্য পুঁজিপতিদের হাতে থাকবে, সরকার লোক দেখানো নিয়ন্ত্রণ করার অভিনয় করে কোন উপকার করতে পারবে না। আমরা কৃষকদের এই পরামর্শ দেব যে তারা নিজেদের নিজেই সংগঠিত করুক ও নিজেরাই চিনি তৈরি করে উপযুক্ত কর থেকে লাভবান হোক। এর জন্য কৃষকদের সংগঠন হল প্রধান শর্ত। আমরা তো দেখছি যে দেশের যে নেতাদের কাছে এটা আশা করা যেতে পারত তারা চিনি কোম্পানী-গুলির অংশীদার বা মালিক; এবং পুঁজিপতি হিসেবে এটা স্বাভাবিক যে তারা যত বেশি করে পারে মুনাফা নিজের কোলে রাখতে চেষ্টা করবে।

ইউরোপে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের' ব্যর্থতা দেখেও আমাদের চেতনা হচ্ছে না ও ছোট ছোট শিল্প ব্যবসায়গুলিকে একটা বড় মেশিনের যন্ত্র করে তোলার জন্য আমরা উঠে পড়ে লেগেছি। এর ফল বেকার বৃদ্ধি ছাড়া আর কি হতে পারে? কৃষক চার পাঁচ মাস আখ মাড়াই, গুড় ও চিনি তৈরি করতে খরচ করত। এখন এই কাজ তার হাত ছাড়া করা হচ্ছে। যে কাজ পঞ্চাশ জন মিলে করত সেটা একজন মেসিনের সাহায্যে করে ফেলবে। বেকারের সংখ্যা বাড়ানোর উপায় ছাড়া এটা আর কি? মিলে দু'চারশ মজুর অবশ্যই কাজ পাবে, কিন্তু পাঁচ-দশ হাজার কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে! শিল্প ব্যবসায়ের এই যুগের এই মহিমা! এখানে ব্যক্তির কোন মূল্য নেই। এখানে যা কিছু তা হল পুঁজি ও মেশিন। এতে গ্রাম রসাতলে যাবে, কুটির শিল্পের সর্বনাশ হবে।

১৫ই জুলাই ১৯৩৩

কৃষকদের কর্জ

ভারত সরকার নিজে এত কর্জ নিচ্ছে, কর্জ নিয়ে তার কাজ চালাচ্ছে। এতে একথা বলা অনুচিত হবে না যে ঋণগ্রস্তদের প্রতি তার সহানুভূতি স্বাভাবিক। অতএব পাথরের ওপর ঘাস গজাচ্ছে অর্থাৎ যে সরকার ভারতীয় কৃষকদের হিতের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন থেকে আসছিল, যে সরকার তার 'খাজনা'র দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত, সে কৃষকদের হিতের জন্য এক উদার আইন করার কথা চিন্তা করছিল। এই উদার আইনকে জন্ম দেবার যশ যুক্তপ্রদেশ পাবে ও সম্ভবত অন্য প্রদেশগুলি শীঘ্রই তার অনুসরণ করবে।

আজ ভারতের কৃষক এত সর্বস্বান্ত কেন? এইজন্য যে যখন থেকে ইংরাজ শাসন আরম্ভ হল অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শ বছর আগে থেকে বিদেশী সরকার সর্বদা কৃষকদের হিত উপেক্ষা ও জমিদারদের হিতের সমর্থন করে আসছে।* অন্য কথা বাদ দিন। যুক্তপ্রদেশের কথা ধরুন। বোধ হয় অন্য কোন প্রদেশের কৃষক এত বিব্রত ও দুঃখী নয়। বোধ হয় অন্য কোন প্রদেশের কৃষক এত কষ্টে নেই। বোধহয় অন্য প্রদেশের জমিদার-তালুকদার এত স্বৈরাচারী নয়। আর কৃষকদের কষ্টের কাহিনী এই দেড়শ বছরের শাসনে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। এই অভাগাদের ওপর পুলিসের, জমিদার-তালুকদারের, শেঠ-মহাজনের, সংক্ষেপে কর্তৃপক্ষের প্রত্যেকের জুলুম আগের মতোই বর্তমান। যুক্তপ্রদেশের কাউন্সিল যদি কখন এই অভাগাদের জন্য কিছু করতে চেয়েছে তখনি "তালুকদারদের' কাউন্সিল জনমতকে পদদলিত করেছে। আমাদের প্রদেশের এই বিশ্বাস হয়ে দাঁড়াচ্ছিল যে এখানে শাসনকার্য তালুকদার জমিদারদের জন্য চালানো হয়। এখন এই প্রদেশে একটি "রাজ-পরিষদ"-এর ব্যবস্থা করে সরকার এই সন্দেহকে আরো দৃঢ় করে দিয়েছে।

তবুও যেখানেই সরকার প্রজার হিতের কোন কাজ করে আমরা সর্বদা তাকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাবার জন্য প্রস্তুত। আমরা চাই যে সরকারের এই প্রকারের কাজে জনগণ সরকারকে যথেষ্ট সাহায্য করুক।

আমরা চাই যে যদি প্রদেশ সরকার কাউন্সিলে কৃষকদের হিতের জন্য কোন আইন করতে চায়, জনগণের প্রতিনিধিদের উচিত তারা সরকারকে সমর্থন জানাক। প্রদেশ সরকার কৃষকদের ঋণের বোঝা হাল্‌কা করার জন্য যে নূতন মুসাবিদা, আইন করার জন্য ৪ঠা জুলাই কাউন্সিলের নৈনিতাল অধিবেশনে পেশ করেছিল, সেটা সবদিক থেকে প্রশংসার যোগ্য। কাউন্সিল সদস্যরা এই প্রস্তাবের জন্য অভিনন্দন জানাবার যে বুদ্ধিমত্তা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমরা তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রয়োজন ও অধিকারের ক্ষেত্রে কম হলেও, খাজনার যথাসাধ্য ছুট দেবার পর জনগণের বাস্তবিক হিত করার সরকারের এটি দ্বিতীয় প্রয়াস। সরকার এই আইনের মুসাবিদা ১৩ই মে প্রকাশ করেছিল কিন্তু মুসাবিদা ও তার সম্বন্ধে বিচার করার জন্য কুড়ি জন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি বসানোর প্রস্তাব ৬ঠা জুলাই করা হয়। এ বিষয়ে আমরা কয়েকজন কাউন্সিল-সদস্যদের মতের সঙ্গে সহমত যে মুসাবিদা কাজের হলেও সরকার এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে না। তালুকদারদের দুলাল এই সরকার এই বিল সম্বন্ধে এতটা বিচার করার সময় দিচ্ছে ও সমর্থন জানাচ্ছে, এটাই আমাদের কাছে আশ্চর্যের বিষয়। আমরা তার এই "আলস্য"কে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যেতে চাই। আশাকরি, মুসাবিদার ওপর বিতর্কের পর ওটা পাশ হয়ে যাবে। বিশেষ কমিটি শীঘ্র বিচার করে সেটাকে পাশ করে দেবে ও কাউন্সিল সেটাকে আইন করে দেবে।

কিন্তু মুসাবিদার সাধারণ বিন্যাস পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে তিনটি বিল করা হয়েছে। একটির উদ্দেশ্য কৃষকদের কর্জ মকুব করা, দ্বিতীয়টির সুদের হার কমানো, তৃতীয়টির সুদ নেওয়া বন্ধ করা। প্রথমটি কেবলমাত্র সেসব কৃষকদের সুবিধের জন্য যারা দু'শর বেশি রাজস্ব বা খাজনা দেয় না। যে আয়কর দেয়, তাকে কৃষক ধরা হবে না। কোন ম্যানিসিপালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া বা টাউন কমিটির সীমায় যারা বাস করে, তথা গ্রামে থেকে পরিশ্রমের দ্বারা, গোরু মোষ ইত্যাদির ব্যবসায় করে জীবিকা অর্জন করে তারাও বিলের দ্বারা লাভবান হবে। জিনিস-পত্রের দাম মন্দা হওয়ায় সর্বস্বান্ত ও ঋণের ভারে পিষ্ট হচ্ছে। নিরক্ষর হওয়াতে সে মহাজনের কাছ থেকে তার ঋণের হিসেব চাইতে বা সেটা বুঝে নিতে পারে না—তিনের জন্য তের দিয়েও সে উদ্ধার পায় না।

মোকদ্দমাবাজি তাকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। এইজন্য প্রথম বিলের বলে সে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করে তার কর্জের মিটমাট ও সেটা কিস্তিতে দেবার ব্যবস্থা করাতে পারে। কর্জ আদায় করার জন্য আদালতে কিছু টাকা জমা দেবার অনুমতি পাওয়া যাবে। ডিক্রির টাকার ভিতরে, মহাজন চার বছর পর্যন্ত ক্ষেতে উৎপন্ন ফসল নিতে পারে। সে ভোগবন্ধক জমিতে কুড়ি বছরের বেশি অধিকার রাখতে পারে না। কৃষক তার জমি বন্ধক দিয়ে কো অপারেটিভ সোসাইটি থেকে লম্বা মেয়াদে ঋণ নিতে পারে। কয়েকটি শর্তে বন্ধকের মেয়াদের মধ্যে সে তার জমি ফেরৎ নিতে পারে। দেনদার যখন ইচ্ছে তার কর্জ শোধ দিতে পারে। মহাজনকে আবশ্যিকভাবে হিসেব রাখতে হবে ও দেনদারের কাছে হিসেব পাঠাতে হবে। যদি সে তার খাতায় কর্জের অঙ্ক বেশি করে তাহলে তার সাজা হবে।

অতএব দ্বিতীয় বিল অনুসারে পাঁচ হাজার টাকার বাৎসরিক খাজনা বা রাজস্ব দানকারীর রক্ষার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। চাষ ও খাজনার আদায় থেকে জীবনযাপনকারীদের রক্ষা করার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। মন্দার জন্য বেচারারা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। মাগ্‌গির সময় যে কর্জ নেওয়া হয়েছিল সেটা সস্তাগণ্ডার দিনে শোধ করা যায় না, এইজন্য সুদের হার কমানোর প্রয়োজন রয়েছে। ১৯১৭ ছিল মাগ্‌গির যুগ। ১৯৩০ এর পর মন্দার যুগ এল। এইজন্য এর মাঝখানে নেওয়া কর্জের সুদ কমিয়ে দেওয়া হবে।

তৃতীয়, বিল অনুসারে অত্যধিক সুদখোরী বন্ধ করা হবে ও সুদের সীমা বেঁধে দেওয়া হবে।

এই প্রকারে পাঠক দেখবেন যে বাস্তবপক্ষে ঋণগ্রস্ত কৃষকদের রক্ষার জন্য আবশ্যক অনেকগুলি কথার দিকে বিলে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয়। কৃষকদের দুর্দশা এতেই দূর হবার নয়। তাদের ঘাড়ে আরো কয়েকটি নূতন বিপদ আছে। কৃষককে কর্জে ডোবাতে পাটওয়ারী বড় ভূমিকা পালন করে। সরকারী খাজনা আগের মতো থাকলে কৃষক কর্জের বোঝায় পিষ্ট হবেই। মহাজন কর্জ দিয়ে কৃষকের রক্ত নিশ্চয়ই চোষে কিন্তু সে বিপদের সময় তার সাহায্যে আসে। এতগুলি বাধা দেখে সে কর্জ দেবে না। এদিকে কৃষকদের খাজনা ইত্যাদির বোঝা আগের মতোই থাকবে। সে তার কাজ চালাবার জন্য টাকা পাবে না। ফলে

জমি থেকে উচ্ছেদ খুব বেশি করে হবে। এইজন্য সরকারের এ বিষয়ে যথেষ্ট ভেবেচিন্তে নেওয়া দরকার। বিশেষ কমিটির তো কেবল মহাজনই নয়, সরকারকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার যাতে সে এতখানি মন্দা হলে এই মাত্রায় খাজনা নেয়।

দ্বিতীয় আবশ্যক কথা এই যে বিলের আইন হবার আশঙ্কায় হালে অনেক মামলা মোকদ্দমা হবে। মহাজন তাড়াতাড়ি তার পাওনা-গণ্ডা আদায় করে নিতে চাইবে। বিশেষ কমিটি মাস ছয়েকে তার কাজ শেষ করবে। ততদিনের জন্য একটা নিয়ম অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) চালু করে দেওয়া দরকার।//

আখচাষীদের সংঘ

আমরা একথা জেনে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করেছি যে গোরখপুর ও বস্তীর আখচাষীদের একটি সংঘ গঠন করা হয়েছে। এই সংঘ মিলওয়ালাদের হাত থেকে তাদের হিত রক্ষা করবে। বেচারা কৃষকরা গরুর গাড়িতে করে আখ আনে ও এক-এক সপ্তাহ ধরে মিল কর্মচারীদের খোশামোদ করতে থাকে, তারপর তাদের আখ মাপা হয়। তাদের থাকার কোন আশ্রয় নেই। রোদ বর্ষা সবকিছু তাদের সহ্য করতে হয়, নিজের কাজের ক্ষতি করে এই হতভাগাদের দিন গুজরান করতে হয়। ততদিনে আখ শুকিয়ে যায় আর দাম পাওয়া যায় কম। এই অসুবিধেগুলি দূর করার জন্য এই সংঘ গঠিত হয়েছে। গোরখপুর ও বস্তীতে চিনি মিলের সংখ্যা সারা প্রদেশের চিনি মিল সংখ্যার অধিক। চিনির ব্যবসার এই অঞ্চল সেই প্রকার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে যেমন কাপড়ের জন্য আমেদাবাদ। আমরা আশা করি সংঘের চেষ্টায় গরিব চাষীদের যথেষ্ট উপকার হবে। সংঘ যদি কৃষকদের এই দাবি নিয়ে সংগঠিত করতে পারে যে তারা তাদের আখ মিলে নিয়ে যাবে না, তা হলে মিলওয়ালাদের নিজের বা ভাড়ার গাড়ি গ্রামে নিয়ে গিয়ে আখ কিনতে হবে। এতে কৃষকদের উপকার হবে। কৃষকদের যতটা আখ বিক্রি করার প্রয়োজন হয় তার চেয়ে মিলওয়ালাদের আখ কেনার প্রয়োজন আরো বেশি। কিন্তু কৃষক গরিব, নগদ টাকার জন্য তাকে নিজে গাড়িতে করে আখ মিলে নিয়ে যেতে বাধ্য হতে হয়। তারা যদি একটু ধৈর্য ধারণ করতে পারে তা হলে মিলওয়ালাকেই আখ নিয়ে আসতে বাধ্য হতে হয়। আখ যদি পাঁচ দশ দিন ক্ষেতে দাঁড়িয়ে থাকে তাতে কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু মিল তো একঘণ্টাও বন্ধ রাখা যায় না।

৭ই আগস্ট, ১৯৩৩

কৃষি সহায়ক ব্যাঙ্কের আবশ্যকতা

কৃষি ভারতের মুখ্য কাজ, তাকে লুঠপাট করার জন্য সকলেই আছে কিন্তু প্রোৎসাহিত করার কেউ নেই। কৃষককে উপোস থেকে এক একটি পয়সার জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবনযাপন করতে হয়। এবার পাব্লিকের দৃষ্টি কৃষির দিকে পড়েছে। বিধান পরিষদে দু-তিনটি বিল পেশ হয়েছে। এগুলিতে কৃষকদের খুব উপকার হবে। কিন্তু সুদের হার কমিয়ে দিলেই কাজ চলবে না। এমন উপায়ও হওয়া দরকার যাতে কম সুদে টাকা পাওয়া যায়। এর জন্য কৃষি সহায়ক ব্যাঙ্ক খোলা আবশ্যক। এ বিষয়ে 'লীডার'-এ মুন্সী গদাধরপ্রসাদ এম. এল. সি-র একটি কাজের চিঠি ছাপা হয়েছে। আমরা আশা করি সরকার এই প্রস্তাব বিচার করে দেখবে। কৃষকদের উদ্ধারের সবচেয়ে জরুরী কথা হল তাদের মহাজনের কবল থেকে মুক্ত করা আর তার সঙ্গে সঙ্গে কম সুদে তাদের টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য ব্যাঙ্কগুলিকে দিয়েই সমাধা হতে পারে।

৭ই আগস্ট, ১৯৩৩

বস্তীতে আখ সংঘ সম্মেলন

কাশী বিদ্যাপীঠের দুজন শাস্ত্রী তাদের অদ্ভুত কার্যক্ষমতার ও চিন্তা শক্তির পরিচয় দিয়ে যুক্ত প্রদেশের একটি বড় অভাব পূরণ করেছেন। বাংলার পাট ও বোম্বাইয়ের তুলো ও তার মিলগুলি যেমন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি যুক্ত প্রদেশের আখের কৃষকদের প্রশ্ন এক এক করে গোটা পঁচিশেক মিল হয়ে যাওয়াতে জটিল হয়ে গিয়েছে। স্থানান্তরে আমরা তাদের কিছু সমস্যা নিয়ে মন্তব্য করেছি ও সেগুলির সমাধানের জন্য কয়েকটি আবশ্যক প্রস্তাব করেছি। কৃষকদের কষ্টের দিকে তাদের সর্বপ্রথম দৃষ্টি যায় দুজন শাস্ত্রীর—শ্রীরামকুমার ও শ্রীশ্যামাচরণের এবং তারা পাঁচ মাস পূর্বে আখ সংঘ সৃষ্টি করেন। সংঘের তিনটি সম্মেলন খলীলাবাদ, বস্তী ও বভনানে (জেলা গোণ্ডা) যথাক্রমে বাবা রাঘবদাস, শ্রীপ্রকাশ ও পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালবীয়ের সভাপতিত্বে হয়ে গিয়েছে। ভিড় যথেষ্ট হয়, উৎসাহও ছিল অপার। শ্রীকৃপাশঙ্কর ও রামশঙ্কর মুখ্তার বস্তীতে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। সম্মেলনের সাফল্য ও তার পবিত্র উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি ও তার সাফল্য কামনা করছি।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

হতভাগা কৃষক

ভারতের শতকরা আশিজন চাষ করে। শতকরা কয়েকজন এমন আছেন যারা তাদের জীবিকার জন্য কৃষকদের মুখাপেক্ষী, যেমন, গ্রামের ছুতার, কর্মকার ইত্যাদি। দেশের হাতে যে সম্পদ রয়েছে তা এই মজুর কৃষকদের পরিশ্রমের আশীর্বাদ। আমাদের স্কুল ও বিদ্যালয়, আমাদের পুলিস ও ফৌজ, আমাদের আদালত ও কাছারি, সব এদের উপার্জনের দৌলতে চলে, কিন্তু দেশের যারা অন্ন ও বস্ত্রদাতা তারাই পেট ভরে আহার পায় না, শীতের ঠাণ্ডায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে ও পোকা-মাকড়ের মতো মরে। এমন যুগ ছিল যখন গাঁয়ের লোক আকার-প্রকার ও বল-পৌরুষের জন্য বিখ্যাত ছিল। যখন গ্রামে যথেষ্ট দুধ ঘি পাওয়া যেত। যখন গ্রামের লোকে দীর্ঘজীবী হত। যখন গ্রামের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর হত। কিন্তু আজ আপনি কোন গ্রামে যান, খুঁজলেও হৃষ্টপুষ্ট লোক পাবেন না। কারো গায়ে মাংস ও কাপড় দেখতে পাবেন না। লোকে যেন চলন্ত কঙ্কাল। অন্য কথা ছেড়ে দিলেও তাদের থাকার জায়গা নেই। তাদের দরজায় দাঁড়াবারও স্থান নেই, নীচু দেওয়ালের ওপর খড়ের চালের ভেতর সে, তার পরিবারের লোকজন, বিচালি, কাঠ, গাই-বলদ সকলেই জীবন যাপন করছে। এমন সময় ছিল যখন ভারতের ধনদৌলত জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার সোনা ও জহরতের চাকচিক্য দূর দূর দেশের কবিদের চোখ ধাঁধিয়ে দিত, বিজেতাদের মুখে জল আসত কিন্তু আজ তা রূপকথার মতো। আজ ভারত দরিদ্র ও অজ্ঞানের এমন গভীর গর্তে পড়ে আছে যে তার তল খুঁজে পাওয়া যায় না। লর্ড কর্জন ১৯০১-এ এখানকার ব্যক্তিগত আয়ের অনুমান বছরে ত্রিশ টাকা করেছিলেন। ১৯১৫-তে অন্য একজন এই অনুমান পঞ্চাশে পৌঁছালেন আর ১৯১৫ এমন সময় ছিল যখন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৩০-এ সেই অবস্থা আবার হল যা ১৯০১-এ ছিল। হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে যে আমাদের ব্যক্তিগত আয় বোধহয় পঁচিশের বেশি নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত

কৃষকদের অবস্থার দিকে নজর দিল না। তাদের অবস্থা আগের মতোই আছে। তাদের চাষের যন্ত্রপাতি, কৃষি-বিধি, কর্জ, দারিদ্র সবকিছু পূর্ববৎ রয়েছে।

না, একথা বলা ভুল হবে যে তাদের অবস্থার দিকে কেউ নজর দেয়নি। তাদের রক্ষা করার জন্য সরকার কখন কখন আইন করছে, আর বোধ হয় এরকমের আইন আরো করা হত যদি জমিদারদের তরফ থেকে বিরোধিতা না করা হত। এবার ছাড়ের ব্যাপারে জমিদাররা কম বাধা দেয়নি। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে এই আইনে কৃষকদের বিশেষ উপকার হয়নি। এই আইনগুলি না থাকলে সম্ভবতঃ তাদের অবস্থা আরো খারাপ হত। এগুলিতে এটুকু লাভ অবশ্য হয়েছে যে তাদের পতনের দিকে যাওয়া থেমেছে কিন্তু উন্নতির জন্য পরিস্থিতি অনুকূল হয়নি। আমরা উন্নতির জন্য এমন বিধান চাই যেগুলি সমাজে বিপ্লব না করেই আনা যায়। আমরা শ্রেণী সংগ্রাম চাই না। হ্যাঁ, এটুকু অবশ্য চাই যে সরকার ও জমিদার উভয়ে একথা যেন না ভোলে যে কৃষকও মানুষ, তারও ভাত কাপড় চাই, থাকার জন্য ঘর চাই। তার ঘরেও সুখ-দুঃখের ব্যাপার হয়, নিজের জাতের লোকের সামনে নিজের কুলের মর্যাদা রক্ষা করতে হয়। অসুখ-বিসুখ অন্যদের মতো তার ঘরেও হয়। সেই জন্য খাজনা ঠিক করার সময় একথা মনে রাখা উচিত যে কৃষক যেন ন্যূনতম জমি চাষ করে এমন মজুরি পায় যাতে সে তার সন্তানদের প্রতিপালন করতে পারে। আমাদের প্রদেশে বেশির ভাগ কৃষকদের তিন-চার একরের বেশি জমি নেই। আরো বেশি সংখ্যক কৃষকদের কাছে এর অর্ধেক জমিও নেই। জমি যত কম হয় চাষের খরচ তত বেশি পড়ে। এজন্য জমির খাজনার হার নূতন করে ঠিক হওয়া আবশ্যক। এতে নিশ্চয়ই জমিদারদের আমদানি কমে যাবে, সরকারকে বাজেট তৈরি করতে বেগ পেতে হবে, কিন্তু অন্য সব কিছুর চেয়ে কৃষকের জীবনের মূল্য আরো বেশি।

কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে খাজনা নিকট ভবিষ্যতে বিশেষ কমবে না। বাস্তব পক্ষে অবস্থা এমন যে ছোট ছোট কৃষকরা চাষে যা খরচ পড়ে তাও তুলতে পারেন না, খাজনার টাকা তোলার তো কথাই নেই। আর ধরে নেওয়া গেল যে দু-এক বছর লাঠির জোরে খাজনা আদায় করে নিল তাতে, হল কি। যে কৃষক না খেতে পেয়ে মরছে সে দুর্বল ও রুগী হবে, চাষে

বেশি পরিশ্রম করতে পারবে না, এতে উৎপাদন ভাল হবে? আমাদের এমন পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে যাতে কৃষক সুখী ও স্বাস্থ্যবান থাকে। জমিদার, মহাজন ও সরকার সকলের আর্থিক সমৃদ্ধি কৃষকের আর্থিক অবস্থার অধীন। তার আর্থিক অবস্থা হীন হলে অন্যদের অবস্থা ভাল হতে পারে না। কোন দেশের সুশাসনের নিকষ হল সেই দেশের সাধারণ জনগণের অবস্থা। মুষ্টিমেয় জমিদার ও মহাজন বা অফিসারদের সুদিনকে দেশের সুদিন মনে করা যায় না।

কৃষকদের জন্য দ্বিতীয় প্রয়োজন হল এমন কুটির শিল্পের যাতে অবসরের সময় সে কিছু আয় করতে পারে। একাজ অসংগঠিত ভাবে সফল হতে পারে না। এটাকে সমবায় সমিতির হাতে দেওয়া উচিত বা সরকার নিজের হাতে রেখে বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগ দ্বারা পরিচালিত করুক। এক প্রদেশে এমন জিনিস আছে যার চাহিদা সেখানে নেই কিন্তু অন্য প্রদেশ-গুলিতে তার ভাল চাহিদা আছে। এমন শিল্পের প্রচার করা উচিত।

কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর দিকে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়নি। সরকার এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র প্রদর্শন ও প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই উপযুক্ত মনে করেছে। ভাল যন্ত্রপাতি, ভাল বীজ, ভাল সার দেখানো যথেষ্ট নয়। শতকরা দুজন কৃষক এই প্রদর্শন থেকে লাভবান হতে পারে। যাদের আহারের ঠিক-ঠিকানা নেই, যারা আকণ্ঠ ঋণে ডুবে আছে সে নূতন বীজ ও যন্ত্রপাতি কিনবে, এমন আশা করা যায় না। সে পুরোনো পথ থেকে এক চুল সরাকে দুঃসাহস মনে করে। নূতন কোন কিছু পরীক্ষা করা, কোন নূতন পরীক্ষার ঝুঁকি নেওয়ার সামর্থ্য তার নেই। তাকে উৎপাদন খরচের দামে এই জিনিসগুলি কিস্তিতে শোধ করার শর্তে দেওয়া উচিত। এ কাজের জন্য সর্বদাই সরকারের টাকার অভাব থাকে। আমাদের মতে এর চেয়ে বেশি জরুরী অন্য কাজ সরকারের নেই।

দ্বিতীয় প্রয়োজন হল জমির চকবন্দী। জমির টুকরা টুকরা-করণ এত বেশি করে হয়েছে যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। দাক্ষিণাত্যে ১৭৭১ সালে গড়পড়তা জোত ছিল চল্লিশ একর। ১৯১৫ সালে এটা কেবল সাত একরে দাঁড়ায়। বাংলায় তিন একর ও যুক্ত প্রদেশে মাত্র দেড় একর। এই দেড় একরও গ্রামের চারদিকে ছড়ানো থাকে, অযথা অনেক পরিশ্রম করতে হয়। চকবন্দী হলে কৃষক তার জমি ঘিরতে পারবে, কুয়ো করতে পারবে,

ক্ষেতের দেখাশোনা করতে পারবে। এতে তার উৎপাদন কিছু বাড়ার আশা করা যেতে পারে।

পোকা প্রায়ই ফসলের খুব ক্ষতি করে। গত বছর ইঁদুরে বহু ফসল ধ্বংস করে। কখনও গান্ধী, কখনও মাহী, কখনও গেরুই আর কখনও পতঙ্গ আছে। কখনও উইয়ের জোর দেখা যায়, কখনও পোকার। এই ভৌতিক উৎপাতের কোন ওষুধ নেই। কৃষি বিভাগ এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছে। এই পরীক্ষিত ব্যবস্থাগুলি বা অভিজ্ঞতা কৃষকদের কানে পৌঁছে দেওয়া দরকার। এটুকুই নয়, এগুলি তাদের দোর গোড়ায় পৌঁছানো চাই। কিন্তু এখানে যা কিছু হয় সব আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়, আর এ হল পেঁচালো ও সময়ক্ষেপকারী। এতে কৃষকদের উপকার হয় না। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়, আমরা মিশনারী উদ্যোগ চাই, আজ পর্যন্ত সরকার কৃষকদের সঙ্গে সৎ ছেলের মতো ব্যবহার করেছে। এখন তাদের জ্যেষ্ঠপুত্রের মতন করে সেরূপ নীতি গ্রহণ করতে হবে। //

১৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

মহাজন ও কৃষক

প্রাদেশিক কাউন্সিলে এখন কৃষকদের কর্জের সুদ কমাবার ও অন্য প্রকারে তাদের মহাজনের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তিনটি বিল পেশ করা হয়েছে, এগুলি নিয়ে খুব বিতর্ক চলছে। আমরা একথা বলি না যে আমাদের সামাজিক জীবনে মহাজনের কোন স্থান নেই, আর তাদের দ্বারা জনগণের কোন উপকার হয় না। কিন্তু এখন মহাজনদের আসামীদের ওপর অত্যাচার করার যে আইনী সুবিধাগুলি দেওয়া আছে, সেগুলি কিছুটা কমাবার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। সুদের একটি সীমা থাকা দরকার ও তার দর বেঁধে দেওয়া উচিত। এখনতো অবস্থা এই যে কৃষকদের কাছ থেকে মূলের কয়েক গুণ সুদ আদায় করা হয়, তবুও মূল যথাস্থানে বজায় থাকে। এমন উদাহরণ ঘরে ঘরে পাওয়া যাবে যে পঞ্চাশ টাকা কর্জ দিয়ে মহাজন আসামীর বিরুদ্ধে দু'শ টাকার ডিক্রী করল, তার যা কিছু ছিল সব নিলাম করিয়ে নেওয়া হল। যখন সর্বত্র সুদের দর পড়ে গিয়েছে তখন কৃষকদের কাছ থেকে সেই পুরনো আমলের সুদ কেন আদায় করা হবে? এই প্রদেশে হুণ্ডীর ব্যবহার খুব বেশি করা হয়। এতে সুদের দর শতকরা তিরিশের বেশি পড়ে। এই লুট বন্ধ হওয়া দরকার। অবশ্য এতে মহাজনের আমদানী কমবে। কিন্তু ইঁদুরগুলি না খেতে পেয়ে মরবে, এই ভয়ে কি মরাইগুলি খোলা রাখা হয়? মহাজনকে বাধ্য হয়ে অল্প সুদে সবুর করতে হবে। এবার সে অল্প টাকা ধার দিয়ে কৃষককে পুরুষানুক্রমে তার গোলাম করতে পারবে না।

৩রা জুলাই ১৯৩৩

ছোট জমিদার না বড় জমিদার?

বিহারের জমিদারদের এক সভায় তাঁর ভাষণে জাস্টিস স্টুয়ার্ট ম্যাকফারসান এই মত ব্যক্ত করেছেন যে প্রজাদের বড় জমিদারের শাসনে ছোট জমিদারদের শাসনের চেয়ে কম কষ্ট হয়। সম্ভবত সেই সভায় বড় বড় জমিদার ও রাজাদের মতাধিক্য ছিল ও তাদের মুখ দেখে সাহেব বাহাদুর তাঁর মত দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে ছোট শয়তানের চেয়ে বড় শয়তান সর্বদাই ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। ছোট শয়তান এক-আধটি পাঁঠা, ফুল মালা, কয়েকটি বাতাসা পেয়ে সন্তুষ্ট হয় কিন্তু বড় শয়তান প্রাণ না নিয়ে ছাড়ে না। ছোট জমিদার তার প্রজার ওপর বেশি কড়াকড়ি করতে ভয় পায়। পুলিস, আদালতের কর্মচারীদের ও কর্তৃপক্ষের ওপর তার এত প্রভাব থাকে না যে সে দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে দাঁড়াতে পারে, আইনকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে দিতে পারে। পেয়াদা ও লাঠিয়ালদের বাহিনী রাখার পুঁজিপাটা তার থাকে না। আর প্রায়ই সে তার প্রজাদের গ্রামেই থাকে এবং তাদের বাস্তবিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দরুন অযথা অন্যায় করে না, কিছু 'মুলাহজা--মুরওত'-ও হয়ে থাকে। অন্য-দিকে বড় জমিদার তার এলাকার বাদশা হয়। প্রজাদের ওপর তার কোন মমতা থাকে না। তারা তার ভোগ-বিলাসের নিমিত্ত মাত্র। প্রজাদের করুণ ক্রন্দনের ধ্বনিও তার কানে যায় না। আর তার কারিন্দা ও পেয়াদারা প্রজাদের ওপর দয়া করতে যাবে কেন? প্রজাদের মরা বাঁচার চিন্তা তারা করতে যাবে কেন?

৬ই নভেম্বর ১৯৩৩

আগ্রা জমিদার সম্মেলন

আগ্রা জমিদার সম্মেলনের সভাপতি ছতারীর নবাব তার ভাষণে জমিদারগণকে সংগঠনের প্রয়োজনের কথাই বলেননি উপরন্তু তাদের সেই সব লোকের সঙ্গে সহযোগিতার আবশ্যকতার কথাও বলেছেন যারা জমিদার নয় কিন্তু পরিকল্পিত উন্নতির সপক্ষে। কিন্তু আমাদের মতে নবাব সাহেব যে বস্তুকে পরিকল্পিত উন্নতি বলছেন সেটির সমর্থক বোধ হয় জমিদার ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যাবে না। জমিদারদের এখন যে ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে সেটা দিনে দিনে আরও ব্যাপক হতে থাকুক, তার পরিধি দিনের পর দিন বিস্তার লাভ করতে থাকুক, পরিকল্পিত উন্নতি এ ছাড়া আর কি। মজার ব্যাপার এই যে কৃষকদেরকে মহাজনের জোর-জুলুম থেকে রক্ষা করার জন্য যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তার থেকে পুরোমাত্রায় লাভবান হবার জন্য জমিদাররা নিজেদের কৃষকদের মধ্যে নাম লেখাতে চান। কৃষকদের সংরক্ষণের প্রয়োজন এইজন্য যে তারা দীন, অশক্ত। তারা একদিকে জমিদারদের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে মহাজনদের। তারা ভাত, কাপড়, বীজ, বলদ কিছুই পাচ্ছে না। এর তুলনায় আমাদের জমিদাররা প্রদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী, প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী। এদের মধ্যে অনেকে আয়েশ ও আরামের জীবন যাপন করে ও যারা তেমন করিতকর্মা নয় তারাও ডাণ্ডার জোরে কৃষকদের দিয়ে তাদের চাষ করায়, নানা প্রকারের বেগার খাটায়, ক্ষতিপূরণ, জরিমানা আদায় করে। পরমানন্দে ভাঙ্ আপিমের নেশা করে। যদি এমন ক্ষমতাবান শ্রেণীর সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে যত অন্যায় করে, যত ইচ্ছে কর্জ নিক কিন্তু এদের আইনের আওতায় আনা যাবে না।

যদি এই সব কার্যকলাপের দ্বারা আমাদের জমিদার শ্রেণী তাদের প্রতি জনগণের যেটুকু বিশ্বাস ও সম্মান অবশিষ্ট আছে তাও হারাবে। জমিদারদের জন্য যখন এই সংরক্ষণগুলি ছিল না তখন তারা হরদম যথেচ্ছ কর্জ নিত, এখন এই সংরক্ষণ পাবার পর তাদের রঙ্গপ্রীতি কি খেল দেখাবে তার কল্পনা করা যায়। প্রবলের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দুর্বলের সংরক্ষণ

চাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু প্রবলের সংরক্ষণ চাওয়ার অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে সে আরো ক্ষমতাবান হতে চায়। আমাদের জমিদার ভাইরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখার কষ্ট স্বীকার করেছেন যে তারা জনগণকে এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এই কথা ভেবে ভেবে তারা ব্যাকুল হচ্ছেন যে আগামী ব্যবস্থায় সংখ্যাগুরুরা তাদের এই অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে, সেই জন্য জমিদারদের নিজেদের সংগঠিত হয়ে সংখ্যাগুরুকে হাতে করে নেওয়া উচিত? এর কারন এছাড়া আর কিছু নয় যে জমিদারদের এতদিন যে অধিকার ছিল তার তারা অপব্যবহার করেছে ও জনগণ চায় না যে সমাজের কোন অঙ্গ এত প্রবল হয়ে উঠুক যে সে দুর্বলদের পদদলিত করতে থাকুক। আমাদের জমিদাররা নিজেদের জন্য সংরক্ষণ ও রেয়াৎ-এর (বিশেষ সুবিধা) জন্য জেদ করায় জনগণের মধ্যে আরো অবিশ্বাস ও ভয় দেখা দিচ্ছে। এই নীতি দ্বারা তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু তাদের সহানুভূতি ও বিশ্বাসের পাত্র হতে পারেন না। তারা যতদিন একথা মনে করবে যে জনগণের হিতেই তাদের হিত এবং তাদের অস্তিত্বের অর্থই হল তাদের আসামীদের সেবা ও সাহায্য করা, ততদিন জনগণ তাদের প্রতি সশঙ্ক থাকবে ও তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেড়েই চলবে। কৃষক এইজন্য সমাজের উপকারী অঙ্গ যে তাকে ছাড়া সমাজের একদিনও চলবে না। দোকানী সারা দিন দোকানে বসে ও চাকর সারাদিন মনিবের আজ্ঞা পালন করে তাদের আয় ন্যায্য করে নেয়। সকলকেই জীবিকার জন্য কিছু না কিছু পরিশ্রম করতে হয়। এমনকি মহাজনকেও প্রায়ই টালবাহানাকারী দেনদারদের পাল্লায় পড়তে হয় ও তার টাকা ডুবে যায়। কিন্তু জমিদারদের কেউ জিজ্ঞেস করুক, তোমরা জনগণের কোন উপকার কর? তোমার শ্রেণীর দ্বারা সমাজের কি কি উপকার হয়? তোমাদের মধ্যে যারা খুব ধনী তারা লখনউ বা এলাহাবাদে বাংলোয় আয়েসে থাক ও যারা এতখানি সৌভাগ্যবান নয় তারা গ্রামে ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়ায় যেমন শৃগাল মরা লাশের জন্য রাতে ঘুরে বেড়ায়। তাদের উদ্যম ছলে বলে কোন প্রজাকে বিপদে ফেলে তার যথাসর্বস্ব হরণ করা। যদি দুজন প্রজার মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় তাহলে তো জমিদারের পোয়া বারো। দুজনের কাছ থেকেই সে অল্পবিস্তর জরিমানা আদায় করে পরমসুখে থাকবে। যদি কার্য উদ্ধার না হল তো সে পুলিসের দালালী করবে ও লুঠে শামিল হবে। এমন

মুফৎ খোর নিকর্মা, লুঠেরা ভোগ সুখলোভী সামাজিক ব্যবস্থা বেশীদিন বাঁচতে পারে না নিজেকে ব্রোঞ্জের দুর্গে বন্ধ করে রাখলেও। জনগণ আজ কারো শিকার হতে চায় না, সে জমিদার হোক, বা মহাজন, সরকার হোক বা মিলমালিক—তার শত্রুতা কারো সঙ্গে নয়, শত্রুতা করার তার শক্তিও নেই, সে অসংগঠিত, দীন পরাধীন। কোন দল নিজেকে সংঘটিত করে তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করতে পারে। কিন্তু যদি কেউ চায় যে তাকে শিকার বানাবে ও তার ভোটও নেবে, তাকে ঠোক্কর লাগাবে ও তাকে দিয়ে পদ সেবাও করাবে, তাহলে তাকে লজ্জিত হতে হবে।

মজার কথা এই যে আজও জমিদার মহাশয়রা নিজেদের জমির মালিক মনে করে। ইংরাজ সরকারের পূর্বে তাদের অবস্থা ছিল সেই দালালদের মতো, যাদের খাজনা আদায় করার জন্য বাদশার তরফ থেকে রাখা হত ও খাজনা আদায় না করতে পারলে বার করে দেওয়া হত খুব অপমান করে। ইংরাজদের রাজত্বে তাদের মান বেড়ে গেল। দেশে সরকারের এমন এক গোষ্ঠীর প্রয়োজন ছিল যারা প্রজার ওপর তার শাসন বিস্তার করতে সাহায্য করবে। সে এই কাজ এই খাজনা আদায়কারীদের কাছ থেকে নেয়। যাক আমরা এই ব্যাপারে যেতে চাই না, তুমি জমির মালিক কেন ঈশ্বর হও না কেন, কিন্তু প্রজার জন্য তুমি কি কর? প্রজার দেওয়া খাজনা থেকে তুমি শতকরা পঞ্চাশ নিয়ে থাক, কিন্তু এর বদলে তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার কর? তুমি বীজ দিলে তার দেড়গুণ আদায় কর, কাঠ বা বাঁশ দিলে তার চারগুণ বেগার নাও, আজ তোমার অস্তিত্ব এমন নিরর্থক হয়ে গিয়েছে যে সন্দেহ হয় ভবিষ্যতে তোমার চিহ্নই শেষ হয়ে যাবে। তুমি সময়ের গতির বিরুদ্ধে চলার চেষ্টা করছ। অল্প সময়ের জন্য হয়ত তোমার এই চেষ্টা সফল হয়ে যাবে কিন্তু সেই দিন দূরে নেই যখন তোমাকে দেশের ইচ্ছার সামনে মাথা নত করতে হবে ও তুমি আতঙ্ক নয় সেবার জোরে তোমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে।

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

আন্দামানের কয়েদী

কয়েদীদের দ্বীপান্তরে পাঠানোর প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সরকার সেই পুরনো হাতিয়ার আবার ব্যবহার আরম্ভ করে দিয়েছে। সারা দেশ একস্বরে এর নিন্দা করেছে। অনেক বন্দী, বিশেষ করে বাঙালী বন্দীদের আন্দামান পাঠানো হচ্ছে। ভারত থেকে যাবার সময় খুবই কষ্ট হয়। এর সঙ্গে দ্বীপে বড় কষ্টের জীবনযাপন করতে হয়। এ বিষয়ে অনেক কথা জানা গিয়েছে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে, আইনের ভয়ে সেগুলি কাগজে প্রকাশ করা যায় না। সেগুলি জানার ও অনুসন্ধান করার বিশেষ উপায় আমাদের নেই। কিন্তু হালে "হিন্দুস্তান টাইম্‌স" প্রভৃতি পত্রিকায় একটি আবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এতে সেখানকার হতভাগ্য বন্দীদের করুণ কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে। নিবেদন পড়লে শিউরে উঠতে হয়। মানবতার নামে, সভ্যতার নামে, সাম্রাজ্যের অঙ্গ হবার নামে, আমরা ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি এবিষয়ে শঙ্কার সমাধান করার জন্য এক্ষুনি তদন্ত কমিশন বসানো হোক। এর চেয়ে বেশি এ বিষয়ে আমরা আর কি লিখতে পারি? আশা করি সরকার এদিকে নজর দেবে।

৫ই জুন ১৯৩৩

দ্বীপান্তরে বন্দীদের মৃত্যু

পাঠকরা জানেন যে ১৯২১ থেকে দ্বীপান্তরের সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের আন্দামানে পাঠানোর প্রথা সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। বন্দীদের স্বাস্থ্যের ওপর সেখানকার জলবায়ু, জেলের অবস্থা ইত্যাদির ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছিল। সরকার যখন কাউকে বন্দী করে তখন সে তাকে নিরাপদে রাখার দায়িত্ব নেয়। ১৯২১ সালে একটি জেল কমিটি আন্দামানের কয়েদখানা পরিদর্শন করে এই সিদ্ধান্ত করে ও সরকার তা মেনে নেয়। আশ্চর্যের কথা এই যে এটা কি করে স্বীকার করা হল! কিন্তু তখনকার দিনে রাজবন্দীদের এত আতঙ্ক ছিল না। এযুগে তো সরকারের দৃষ্টিতে তার বিরোধিতা করা সব চেয়ে বড় পাপ। সাধারণ বন্দীদের ওপর তো দয়া করা যেতে পারে, কিন্তু রাজনীতিক বন্দীরা দয়ার পরিধির বাইরের জীব। সেখানে বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের খবর পাওয়া গিয়েছে। বন্দীরা ১২ই মে থেকে অনশন করছেন। এখন পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুঃখের ঘটনাগুলি যে পরিস্থিতিতে হয়েছে সেটা আরো শঙ্কাজনক। প্রয়াত মহাবীর সিংহ ১২ই মে অনশন আরম্ভ করেন। ১৭ই মে সিনিয়ার মেডিক্যাল অফিসার তাঁকে নাক দিয়ে দুধ খাওয়াবার হুকুম দেয়। এতে তিনি এত কষ্ট পান যে দুঘণ্টা পরে হেঁচকি উঠতে লাগল এবং ফলে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে মনি-কৃষ্ণ দাস মাত্র একদিন অনশন করলেন, পরের দিন তিনি স্বেচ্ছায় আহার গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনিও মারা গেলেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে তাঁর নুমোনিয়া হয়েছিল। এই প্রকারে তৃতীয় বন্দী মোহিত মোহন মৈত্রের সেই দিনই নুমোনিয়া হল যেদিন মণিকৃষ্ণ দাসকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আর দুদিন পরে মৈত্রেরও মৃত্যু হয়। এখন এই তিন বন্ধুরা সেই জগতে আছেন যেখানে নেই রাজনৈতিক সাজা ও না আছে অপ্রাকৃতিক ভোজন বিধি আর নুমোনিয়া। এই খবরে ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি হয় ও জনসাধারণ নানা প্রকারের সন্দেহ করতে লেগেছে। কয়েকটি সভাও হয়ে গিয়েছে ও সরকারের নিকট অনুরোধ জানানো হয়েছে যে ব্যাপারটির কড়া তদন্ত হওয়া চাই ও বাকি বন্দীদের ভারতে ফিরিয়ে আনা হোক।

১২ই জুন ১৯৩৩

বন্দীদের দ্বিতীয় দল আন্দামানের দিকে

সব কিছুই হল। নানা স্থানে সভা হল, সংবাদপত্রগুলি রব তুলল, স্যার হেনরী ক্রেকের কাছে ডেপুটেশন গেল, নিবেদন জানানো হল বন্দীদের আর যেন আন্দামান না পাঠানো হয়, তদন্ত কমিটি বসানো হল কিন্তু ফল কিছুই হল না। পাঞ্জাব থেকে এক ইংরেজ অফিসারকে আন্দামান পাঠানো হল, যার অনশনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ হল না। 'মাদ্রাস মেল' পত্রিকার খবরে প্রকাশ– হালেই বন্দীদের এক নূতন দলকে আন্দামান পাঠানো হয়েছে। কেনই বা পাঠানো হবে না। সেই সরকারই কেমন যে কারো কথা শোনে!

১৭শে জুন ১৯৩৩

আবার সেই সাক্ষ্যের খেলা

সিলেক্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির সামনে বিবৃতির সেই নাটক আবার আরম্ভ হয়ে গেল যা সাইমন কমিটির সামনে হয়েছিল। আবার আলাদা আলাদা সংস্থাগুলি নিজ-নিজ স্বার্থের গান গাইতে লেগেছে। জমিদার ও তালুকদারদের* বিশেষ মতাধিকার চাই ও প্রদেশগুলিতে আপার হাউসও। এরপর লীগওয়ালারা আসবে, আর সিন্ধু ও বেলোচিস্তানের খেল শুরু হয়ে যাবে। তখন গোলটেবিল কন্‌ফারেন্সের বদলে চতুষ্কোণ কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হবে। এইভাবে এই নাটক চলতে থাকবে, আর এদিকে ভারতের অবস্থা হীন থেকে হীনতর হতে থাকবে, সরকারের খরচ বাড়তে থাকবে, জনসাধারণের ঘাড়ে কর বাড়তে থাকবে, সরকারী কড়াকড়ি বাড়তে থাকবে, বেকারদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। সরকার জিতেছে আর জিতের পুরস্কারে ভার্সাইয়ের সন্ধির পরিণাম জানে না।

২৬শে জুন ১৯৩৩

---

* বাংলার জমিদার—উত্তর প্রদেশের তালুকদার ও বাংলার তালুকদার —উত্তর প্রদেশের জমিদার। — অনুবাদক।

আন্দামানের বন্দী

খবরে প্রকাশ, ২৬শে জুন আন্দামানের বন্দীদের অনশন শেষ হয়েছে। কেন ও কিভাবে শেষ হল তা ঠিক বলা যায় না। কংগ্রেস, জনগণ ও সংবাদপত্রের বিরোধিতার এই পরিণাম হল যে সরকার বন্দীদের কিছু দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছে বা অন্য কোন কারণ আছে? যাই হোক, অনশন শেষ করার ক্ষেত্রে সরকারের নিশ্চয় হাত আছে। অতএব আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৩রা জুলাই ১৯৩৩

মীরাট মোকদ্দমার রায়

সাড়ে চার বছর আগে যখন মীরাটে ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছিল তখন পুলিস এত শোরগোল করল, এত ধূমধাম করে প্রস্তুতি চালানো হল, এত সাক্ষী সাবুদ জমা করা হল, এত টাকা খরচ করা হল, মনে হচ্ছিল যেন এই ষড়যন্ত্র দুনিয়ার রাজপাট উলটে দিতে চাইছিল ও পুলিশ এটা খুঁজে বের করে এমন সাফল্য অর্জন করেছে যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডওয়ালারা তাদের শাকরেদ বনে যেতে পারে। খামোখা সাক্ষীর সংখ্যা বাড়িয়ে মোকদ্দমা দীর্ঘস্থায়ী করা হল, সাড়ে চার বছরে ষোল লাখ টাকা ধ্বংস করা হল। দায়রা জজ তো মনে করলেন এই সমস্ত আয়োজনের অনুপাতে সাজা দেওয়া যশের কাজ হবে। কয়েকজন অভিযুক্তকে দ্বীপান্তরের সাজা দিয়ে দিলেন, ন্যায়নীতি অনুসারে এই অধিকার তার ছিল না। কিন্তু হাইকোর্ট আপিলের যে রায় বেরিয়েছে, তা সরকারের চোখ খুলে দিয়ে থাকবে, আর সে বুঝে ফেলে থাকবে যে অভিযুক্তদের যেমন রাক্ষস বানিয়ে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল সেটা কতখানি ভিত্তিহীন। কয়েকজন অভিযুক্তকে হাইকোর্ট একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, কয়েকজনের জন্য যে সাড়ে চার বছর তারা জেলে ছিলেন সেটাকেই যথেষ্ট মনে করল। মাত্র চার জনকে দুবছর করে আরো জেলে থাকতে হবে। যে অপরাধের সাড়ে চার বছরের সাজা হাইকোর্ট যথেষ্ট মনে করল, তার জন্য দায়রা জজ দ্বীপান্তরের সাজার ব্যবস্থা করে ন্যায়কে কত ভয়ঙ্কর করে তুলেছিলেন! এই প্রসঙ্গে আমরা হাইকোর্টের রায়ের সেই অংশ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি যেটাতে জজেরা দেখিয়েছেন যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সব সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ানো অনাবশ্যকই নয়, আপত্তিকরও বটে। ম্যাজিস্ট্রেটের ততখানি সাক্ষ্য নেওয়া উচিত যাতে তার বিশ্বাস জন্মায় যে মোকদ্দমা দায়রা আদালতে পাঠানোর মতো। প্রথম দেড় বছর ধরে সে সব সাক্ষীর সাক্ষ্য নিল, তারপর মামলা দায়রা আদালতে পাঠানো হল আর সেখানে পুরো নাটকটা আবার অভিনীত হল। এতে

দেশের যে টাকার অপচয় হল সেটা তো হলই, অভিযুক্তদের কত কষ্ট ভোগ করতে হল, আর তাদের যে জীবন নষ্ট করা হল, তার হিসেব কে করতে পারে? এছাড়া এত জরুরী নয়, সে কথা হাইকোর্ট পরিষ্কার বলেছে যে একই কথা প্রমাণ করার জন্য সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ না দিয়ে খামোখা অনাবশ্যক সাক্ষ্য নেওয়া হোক। এই সব নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করে মামলাকে এত লম্বা করা হয়েছে। এই মামলা তিন বছর আগেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। আর যখন পুলিস বেশি সাক্ষী পেশ করে তখন অভিযুক্তরা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বেশি করে সাক্ষী আনে, যাতে তাদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগগুলি খণ্ডন করতে পারেন। কিন্তু একথা কে জিজ্ঞেস করবে, অন্তত পুলিস সন্তোষ লাভ করবে যে, সে এতজনকে সাড়ে চার বছর জেলে পচিয়েছে!

১৩ই আগস্ট ১৯৩৩

নিরক্ষরতার দোহাই

আমাদের কৃষকদের নিরক্ষরতার দোহাই দেওয়া একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু নিরক্ষর হলেও কৃষকরা অনেক সাক্ষরদের চেয়ে বুদ্ধিমান। সাক্ষরতা ভাল, এ হলে জীবনের কয়েকটি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু কৃষককে একেবারে মূর্খ বলে মনে করলে তার প্রতি অন্যায় করা হয়। সে পরোপকারী, ত্যাগী, পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, দূরদর্শী, সাহসী, সৎ, দয়ালু, সত্যবাদী। সে নেশাভাঙ করে না। তার কাছ থেকে আর কি চাই। কয়জন সাক্ষরদের মধ্যে এই গুণ পাওয়া যায়। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে সাক্ষর হয়ে মানুষ ধূর্ত, অসাধু, আইনবাজ ও আলসে হয়ে যায়। কৃষকদের সর্বনাশ এইজন্য হয় না যে সে সাক্ষর নয়। কিন্তু যে অবস্থায় তাকে জীবনযাপন করতে হয় তাতে বড় বড় বিদ্বানরাও সফল হতে পারে না। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অভাব হল সংগঠনের যার জন্য জমিদার, মহাজন, আমলা সকলেই তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে। কিন্তু যদি কেউ তাদের মধ্যে সংগঠন করতে চায় যাতে তারা এই নেকড়েদের নখর ও থাবা থেকে মুক্তি পেতে পারে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ রাজদ্রোহ ও হিজ ম্যাজেস্টির প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াবার অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে ও জেলে যেতে হবে। কৃষক হাজার সাক্ষর হোক, যতক্ষণ সে সংগঠিত হচ্ছে না, যতক্ষণ সে তার অধিকারের জ্ঞান লাভ করছে না, যতক্ষণ সে বিরোধী শক্তিগুলির মোকাবিলা করতে পারছে না, ততক্ষণ তার জীবন সুখী হবে না। তার কাছে দুটি পয়সা দেখে জমিদার, আমলা সকলের জিহ্বা দিয়ে জল পড়তে থাকে ও একটা না একটা ওজুহাতে কৃষকের ট্যাক শূন্য করে দেওয়া হয়। যদি রাজদ্রোহের ভূত খাড়া করা হোত না তাহলে জাতীয় সেবকরা কৃষকদের অনেকটা সংগঠিত করে ফেলত। কিন্তু এখানে তো নীতি হল প্রজাদের মধ্যে রাজনীতি চেতনা জাগ্রত না হতে দেবার, হলে সে নিজের অধিকারের জন্য রুখে দাঁড়াতে শিখে ফেলবে। এই জন্য তাদের সংগঠনের দায়িত্ব সরকারী প্রচার বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। তারা বড় বড় জায়গায়

গিয়ে ইংরাজদের রাজত্বের মহিমা কীর্তনের কবিতা শোনায়। একদিকে জনগণকে মাদকদ্রব্যের ক্ষতির উপদেশ শোনানো হয়, অন্যদিকে এমন সব ব্যবস্থা করা হয় যাতে লোকে বেশী বেশী করে মাদক দ্রব্য সেবন করে, যাতে সরকারের আমদানী কম না হয়। যতদিন এই নীতির প্রাধান্য থাকবে, সাক্ষরতাতে কোন লাভ হবে না। আমরা বিদ্বানদের লুঠপাট করতে দেখি, মনে সন্দেহ জন্মায় এই কি বিদ্যা যার মহিমা কীর্তন করা হয়। যদি সরকার সত্যিই জনহিত চায় তা হলে ম্যাজিক ল্যানটার্ণ, বক্তৃতা, সিনেমার ছবি দিয়ে অল্প দিনে স্বাস্থ্য রক্ষা ও ভাল ফসল উৎপন্ন করার পদ্ধতির প্রচার করতে পারে। যে কৃষকের দোরে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই সে তাজা হাওয়া কোথা থেকে আনবে, যার খাবার অন্ন নেই সে ভাল সার কোথা থেকে আনবে। আমরা বলতে চাই গ্রামবাসীদের নিরক্ষরতা তাদের রক্ষা করছে, তা না হলে সেই ছল-চাতুরী, সেই বিলাসিতা, সেই স্বার্থপরতা তাদের মধ্যে দেখা দিত যা আজকার বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। যারা আমাদের কৃষকদের নিরক্ষর বলে তাদের ওপর দয়া করতে চান, তারা এই নিরক্ষর ভট্টাচার্যদের কাছে শেখার মতো অনেককিছু পাবেন। আজ শতকরা আশি জন সাক্ষর বেকার বসে তাদের সাক্ষরতার নিয়ে বিলাপ করছে। এমন সাক্ষরতা কৃষকদের পক্ষে মারাত্মক হবে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল সংগঠনের যাতে এত সহজে তারা শোষিত না হয় এবং এই সংগঠন হল রাজদ্রোহ।

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

জবরদস্তি

ভারতীয় কৃষকদের এখন যেমন শোচনীয় অবস্থা সেটা কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। নিজের দুর্দশার কথা তারা স্বয়ং জানে—বা তাদের ভগবান জানেন। জমিদারের ঠিক সময়ে তার খাজনা চাই, সরকারের ঠিক সময়ে খাজনা চাই, খাবার জন্য দু'মুঠো অন্ন চাই, পরার জন্য একটা ন্যাকড়া চাই, চাই সবকিছু, কিন্তু একদিকে তুষার তথা অতিবৃষ্টি ফসল নষ্ট করছে, একদিকে ঝড় তার অবশিষ্ট ক্ষেতকে ধ্বংস করছে অন্যদিকে রোগ, প্লেগ, বিসূচিকা শীতলা তাদের তরতাজা নবযুবকদের ভরা যৌবনে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, যেমন শস্যে ভরা ক্ষেত ছ'দিন আগে শিলাবৃষ্টিতে পুড়ে গিয়েছিল। অন্ন জন্মাচ্ছে কিন্তু দর এত মন্দা যে কেউ দুবেলা আহার করতে পারে না। স্ত্রীর গায়ে যে দু-চারটি গয়না ছিল, সেগুলি মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সরকারের খাজনা দিতে চলে গিয়েছে। শিশুরা যে ন্যাকড়া গায়ে দিয়ে শীত কাটাত, তাই এখন তাদের পিতা পরে তার লজ্জা নিবারণ করছে। যার গায়ে এইটুকু কাপড় আছে যেটুকু দিয়ে বড়জোর সে ঘোমটা দিতে পারে—কাপড় হাঁটু পর্যন্ত সরে এলে আসুক।

একদিকে এই দুরবস্থা, অন্যদিকে আমাদের শাসকরা শিমলা, নৈনিতাল ও তাতেও কাজ না হলে লণ্ডনে বায়ু সেবন করছে। আমাদের প্রতিনিধি ও মেম্বাররা যতক্ষণ বড় বা ছোট কাউন্সিলের মেম্বার হন না তাঁরা পাকা রোদেও এদিক সেদিক রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কাউন্সিলের মেম্বার হওয়া মাত্র তারা পাহাড়ে চলে যান ও সেখানে দৈনিক দশ টাকা ভাতা কামিয়ে নেন। আপনি গিয়ে কৃষকদের জিজ্ঞেস করুন তো, কজন কৃষক এদিকে একসঙ্গে দশ টাকা দেখেছে? কিন্তু না—এটা কলিযুগ। কর্মযুগ। ভাগ্যের খেল। কৃষক এসেছে, জগতের আবর্তে পচে মরবার জন্য!

একদিকে বড় বড় জমিদার তাদের স্বার্থরক্ষার কথা চিন্তা করছে। একদিকে সরকার শ্বেতপত্রে শ্বেত খড়িমাটি দিয়ে কিছু লিখছে। অন্যদিকে কৃষকরা কেবলমাত্র এইটুকু বুঝতে পারছে যে তাদের বিপদ বেড়েই চলেছে। সরকার তাদের জন্য অনেক কিছু করার দম্ভ প্রকাশ করে কিন্তু আজ পর্যন্ত

সে কি করছে? ব্যাঙ্ক-তদন্ত কমিটি কৃষকদের দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল অবিলম্বে "জমি বন্ধক ব্যাঙ্ক" খোলার জন্য যাতে কৃষকরা মহাজনদের কবলে না পড়ে, চাষের উন্নতির জন্য সহজে টাকা পেতে পারে ও কিছু উন্নতি করতে পারে। সরকার নতুন আইন করেছে যার লক্ষ্য অত্যধিক সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে গরিবদের রক্ষা করা। একটি বাঁধা দরের চেয়ে বেশী সুদ গ্রহণকারী তার আসামীকে গ্রেপ্তার করাতে পারবে না। সে আদালতে মামলা করতে পারবে। এতেও কৃষকরা খানিকটা উপকৃত হবে। এখন তো চারদিকে হাহাকারই শোনা যাচ্ছে। যদি কৃষকদের রক্ষা না করা হয় তা হলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে পারে।

রাও কৃষ্ণপাল সিংহ যুক্ত প্রদেশ কাউন্সিলের সদস্য। দুর্ভাগ্যবশত জমিদার তালুকদারদের জন্য এই কাউন্সিল জড় ও সারহীন লোকের সংস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে কৃষকদের স্বার্থকে ততই কম মনে করা হয় যতখানি দেশের স্বার্থকে। এই কাউন্সিলে দলিত জাতির সদস্যও আছেন। শোনা যায় এদের একজন নেতাও আছেন। কিন্তু আমরা এটুকু মাত্র দেখেছি যে এই সদস্যরা সর্বদা সরকারের, সরকারী প্রস্তাবের সঙ্গে থাকেন। এই প্রকারে কাউন্সিলে অভাগা কৃষকদের দিকে কারো নজর যায় না। কয়েকজন সদস্য কৃষকদের হৃদয় ও মন দিয়ে সেবা করতে চান, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। সি. ওয়াই. চিন্তামণি, কুঁঅর জয়ভান সিংহ, মুন্‌শী গদাধর প্রসাদ এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে। আর এদের আগে যদি কারো নাম করতে হয় তা হলে তিনি হলেন আওয়াগড় নরেশের ভাই রাও কৃষ্ণপাল সিংহ।

রাও সাহেব হালে "লীডার" পত্রিকায় কৃষকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে একটি মর্মস্পর্শী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়েছেন। প্রবন্ধের প্রত্যেক পংক্তিতে জীবন আছে। তিনি লিখেছেন যে যুক্ত প্রদেশ সরকারের কৃষক সংক্রান্ত নীতি কেবল "জোর জবরদস্তির অর্থনীতি''। যে করে হোক, মারধর করে খাজনা আদায় করে নাও—ব্যস, এই তার একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর ভাষায়—

''ভারতীয় কৃষকদের ঘাড়ে যে বোঝা চেপে রয়েছে তার সঠিক না হলেও আংশিক আন্দাজ করা যেতে পারে। অত্যধিক খাজনা, জমিদারের খাজনা (খুদকাস্ত ইত্যাদির), মহাজনের শোষণ ও আমলাদের বে-আইনী আদায় কৃষকদের দারুণভাবে দরিদ্র করে ছাড়ে এবং দারিদ্র্যই তার ভাগ্য।…এই জন্ত এর থেকে মুক্তির পথ দেখতে পাওয়া যায় না। বিপ্লবী রাজনীতিজ্ঞ হোক বা

অভিব্যক্তিবাদী, তার উচিত ভিত্তি স্থাপিত করার জন্য প্রথমে ঘোর পরিশ্রম করুক, তখন অর্থনীতিজ্ঞ তার ওপর এক নূতন ইমারত খাড়া করতে পারে।"

রাজনীতিজ্ঞ কি করবে—এ-বিষয়ে রাও সাহেবের পরামর্শ খুবই উপযুক্ত এবং তার দিকেই দেশের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য। একটি ছোট টিপ্পনীতে এই বিবিধ ও কষ্টদায়ক সমস্যার উপর বিশেষ আলোকপাত করা সম্ভব নয়। কি করা উচিত, একথা ভেবে আমরাও চুপ করে থাকি। উপায় যা কিছু আছে তা সরকারের হাতে—সরকার প্রাদেশিক কাউন্সিলকে দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু কাউন্সিলের ধনী, জোট বাঁধা সদস্যরা কোন উপায় বলে দিলে তার সরকার অনুসরণ করবেন, এতে আমাদের সন্দেহ আছে। এইজন্য সন্দেহজনক হলেও রাও সাহেবের পাঁচটি কথার ওপর নজর দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

১—খাজনা যথেষ্ট কমানো হোক। খাজনা মাপ করা হোক বা কিস্তিতে আদায় করা হোক। ভূমি-কর জমিদারের বাস্তবিক আদায়ের ভিত্তিতে বসানো হোক, আদায়ের সম্ভাবনার ভিত্তিতে নয়।

২—জলকর এত কমানো হোক যাতে সকলে সস্তায় জল নিতে পারে, আজকালকার মতো কেবল ধনীরাই নয়।

৩—জমিদারদের তাদের দায়িত্ব শেখানো উচিত। আইনী আদায় থেকে বেশি আদায় করার অনুমতি দেওয়া বন্ধ করা উচিত।

৪—যতখানি সম্ভব কৃষকদের বর্তমান কর্জ মাপ করে দেওয়া হোক ও আইন করে সুদের দর বেঁধে দেওয়া হোক। মহাজনদের খাতা রাখতে বাধ্য করা হোক, কৃষকদের কিনে নেবার জন্য 'টাকা' দেওয়া বন্ধ করা হোক।

৫—সরকারী অফিসারদের বে-আইনী আদায় বন্ধ করা হোক। বড় সরকারী অফিসারদের বেতন কমানো হোক ও সেই টাকা থেকে কম বেতনের সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হোক।

নৈনিতালে কাউন্সিলের অধিবেশনে বিচারার্থ এই প্রশ্ন উঠবে, এতে সন্দেহ আছে! কৃষকদের খোঁজ খবর নেওয়ার কার ফুরসুত আছে, অবকাশ আছে। তবুও আমরা এটুকু বলে দিতে চাই যে যদি রাও সাহেবের পরামর্শ সরকার স্বীকার না করে, তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে সে কৃষকদের স্বার্থের দিকে বিশেষ নজর দেয় না।

৮ই মে ১৯৩৩

লণ্ডনে ভারতীয় সাহিত্যিকদের এক নূতন সংস্থা

আমরা একথা জেনে সত্যি আনন্দিত হয়েছি যে আমাদের সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল যুবকদের সাহিত্যে এক নূতন স্ফূর্তি ও জাগৃতি আনার নেশা পেয়ে বসেছে। লণ্ডনে The Indian Progressive Writer's Association এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে। ওখান থেকে যে ঘোষণাপত্র পাঠানো হয়েছে তা দেখে আশা করা যায় যদি এই সংস্থা তার নূতন পথে স্থির থাকে তাহলে সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত হবে। সেই ঘোষণাপত্রের কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

ভারতীয় সমাজে বড় বড় পরিবর্তন হচ্ছে। পুরোনো চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের শেকড় নড়ে উঠেছে ও এক নূতন সমাজের জন্ম নিয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যসেবীদের সাধনা হোক ভারতীয় জীবনে যে বিপ্লবের জন্ম হচ্ছে তারা তাকে শব্দ ও রূপ দিক ও দেশকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করুক। পুরোনো সভ্যতা নষ্ট হয়ে যাবার পর থেকে ভারতীয় সাহিত্য জীবনের বাস্তবিকতা থেকে পালিয়ে উপাসনা ও ভক্তির আশ্রয়ে গিয়ে লুকিয়েছে। ফল এই হয়েছে যে সে নিস্তেজ ও নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছে রূপেও, অর্থেও। তাই আজ আমাদের সাহিত্যে ভক্তি ও বৈরাগ্যের বন্যা ডেকেছে। ভাবপ্রবণতা প্রদর্শন করা হচ্ছে, বিচার ও বুদ্ধিকে এক প্রকার বহিষ্কার করা হয়েছে। গত দু শতাব্দী ধরে বিশেষ করে এই প্রকারের সাহিত্যে রচনা করা হয়েছে যা আমাদের ইতিহাসে লজ্জাকর যুগ। এই সভার উদ্দেশ্য আপন সাহিত্য ও অন্য কলাগুলিকে পুরোহিত, পাণ্ডা ও অর্থবান শ্রেণীগুলির আধিপত্য থেকে মুক্ত করে সেগুলিকে জনগণের নিকটতম সংসর্গে আনা, সেগুলিতে জীবন ও বাস্তবতা সৃষ্টি করা যাতে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে পারি। আমরা ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যগুলি রক্ষা করে দেশের পতনশীল প্রবণতাগুলির নিষ্ঠুরভাবে সমালোচনা করব ও সমালোচনামূলক ও সৃজনশীল কীর্তিগুলিতে সেই সব কথার সমাবেশ করব যার সাহায্যে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারি। আমাদের ধারণা যে ভারতের নূতন সাহিত্যে আমাদের বর্তমান জীবনের মৌলিক

তথ্যগুলির সমন্বয় করা উচিত। সেই মৌলিক তথ্য হল আমাদের ভাত কাপড়ের, আমাদের দরিদ্রতার আমাদের সামাজিক অবনতির ও আমাদের রাজনীতিক পরাধীনতার প্রশ্ন। তা হলেই আমরা এই সমস্যাগুলিকে বোঝাতে পারব ও আমাদের মধ্যে কার্যকরী শক্তি দেখা দেবে। যা-কিছু আমাদের নিষ্ক্রিয়তা, অকর্মণ্যতা ও অন্ধবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়, তা হেয়। যা কিছু আমাদের মধ্যে সমীক্ষার মনোবৃত্তি আনে, আমাদের প্রিয়তম গোঁড়ামিগুলিকে বুদ্ধির নিকষে যাচাই করতে উৎসাহিত করে, কর্মিষ্ঠ করে ও সংগঠনের শক্তি উৎপন্ন করে, তাকেই আমরা প্রগতিশীল মনে করি।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে সম্মুখে রেখে এই সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে—

১। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে লেখকদের সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, এই সংস্থাগুলিতে সম্মেলন, পুস্তিকা ইত্যাদির দ্বারা সংযোগিতা ও সমন্বয় সৃষ্টি করা। প্রাদেশিক, কেন্দ্রীয় ও লণ্ডনের সংস্থাগুলির মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপিত করা।

২। সেই সব সাহিত্যিক সংস্থাগুলির মধ্যে মেলামেশার সম্পর্ক স্থাপিত করা যারা এই সভার উদ্দেশ্যের বিরোধী নয়।

৩। প্রগতিশীল সাহিত্যের রচনা ও অনুবাদ করা, যেগুলি কলার দৃষ্টিতেও ত্রুটিহীন, যা দিয়ে আমরা সাংস্কৃতিক অবসাদ দূর করতে পারি, ভারতের স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নতির দিকে এগুতে পারি।

৪। হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা ও ইন্দো-রোমান লিপিকে জাতীয় লিপির স্বীকৃতির চেষ্টা করা।

৫। সাহিত্যিকদের হিত রক্ষা করা, সেই সব সাহিত্যিকদের সাহায্য করা যারা নিজের বই প্রকাশ করার জন্য সাহায্য চায়।

৬। চিন্তা ও মতকে স্বাধীন করার জন্য প্রচেষ্টা করা।

ঘোষণাপত্রে সর্বশ্রী ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ, ডঃ কে. এস. ভট্ট, ডঃ জে.সি. ঘোষ, ডঃ এস. সিংহ, এস. ডি. তাসীর ও এস. এস. জহীরের নাম আছে। ও পত্রালাপের ঠিকনা হল—

ডঃ এম আর. আনন্দ
৩২, রাসেল স্কোয়ার, লণ্ডন।

আমরা এই সংস্থাকে হৃদয়ের সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি ও আশা করছি যে সংস্থা দীর্ঘজীবী হবে। যথার্থই আমাদের এইরূপ সাহিত্যের প্রয়োজন আছে ও আমরা এই আদর্শই আমাদের সম্মুখে রেখেছি। 'হংস'-ও এই উদ্দেশ্যগুলির জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা এখনো ইন্দো-রোমান লিপিকে জাতীয় লিপি রূপে স্বীকার করতে প্রস্তুত নই, কারণ আমরা নাগরী লিপিকে সংশোধন করে এত পূর্ণ করে নিতে চাই যাতে ভারতের সব ভাষাগুলির জন্য তা সমানভাবে উপযোগী হতে পারে। আমরা একথাও বলে দিতে চাই যে যদি এই সংস্থা ভারতের সেই সাহিত্য যা তার উদ্দেশ্যের অনুকূল ইংরাজীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে সাহিত্য ও দেশের উভয়েরই বাস্তবিক সেবা হবে। আমরা হিন্দী লেখক সঙ্ঘের সদস্যদের কাছে নিবেদন করতে চাই যে তারা এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে চিন্তা করুন ও ঐগুলি সম্বন্ধে তাদের মতামত প্রকাশ করুন। লেখক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও এই সংস্থার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মেলে ও উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা না হবার কোন কারণ নেই।

জানুয়ারী ১৯৩৬

প্রগতি লেখক-সঙ্ঘ

Indian Progressive Writer's Association সম্বন্ধে গত কোন সংখ্যায় আলোচনা করেছি। আমরা এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমেরও উল্লেখ করেছিলুম। আমরা খুশী যে সঙ্ঘ উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। তার মুখ্য কার্যালয় প্রয়াগে। আলিগড়, লাহোর, দিল্লী, অমৃতসর, লখনউ আদি স্থানে তার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এলাহাবাদে সেটা এক সক্রিয় সাহিত্যিক সংস্থার রূপ ধারণ করে চলেছে। এর নাম থেকে যা পরিষ্কার, সঙ্ঘ সেই সাহিত্য ও শিল্প-প্রবৃত্তির পরিপোষক যা সমাজে জাগৃতি ও স্ফূর্তি আনবে, যা জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির ওপর আলোকপাত করবে। সঙ্ঘ ১০ই এপ্রিল লখনউতে তার বাৎসরিক সম্মেলন করা ঠিক করেছে। যে সজ্জনরা সঙ্ঘের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল তারা শ্রীযুক্ত এস. এস. জহীর, ৩৮ ক্যানিং রোড, এলাহাবাদ, এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করতে পারেন।

এপ্রিল ১৯৩৬

পরিতোষ

'হংস'-এর আত্মকথা সংখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বে সহযোগী 'ভারত' 'হংস'-এর বন্ধুদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে আত্মকথা সংখ্যা বের করলে কোন লাভ হবে না, এটাতো কেবল আত্মবিজ্ঞাপনের একটা ছুতো। তার ভাষা ঠিক এই ছিল না কিন্তু ভাব এই ছিল। দুর্ভাগ্যবশত আমি আত্মকথার খুব সমর্থক ও ওটাকে সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মনে করি। আমি জানি যে তাঁর এই পরামর্শে, যাতে দোষারোপের গন্ধ ছিল, আমি ক্ষুব্ধ হলুম ও আমি আমার কথা কাশী থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'জাগরণ'-এ একটি নোটে প্রকাশ করলুম। জাগরণের সম্পাদক মহাশয় আমার এই লেখা পড়ে আশ্চর্যচকিত হলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সেই লেখা প্রকাশ করা উচিত মনে করলেন। হ্যাঁ, নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য লেখাটি সম্বন্ধে একটি টিপ্পনী যোগ করলেন। আমি এই লেখাটি আবার দেখলুম, লেখার জন্য আমার দুঃখ হল। সংবাদপত্রের জগতে এই প্রকারের দোষারোপ চলতে থাকে। ক্ষুব্ধ হবার আমার তেমন বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। 'ভারত' আমার চিন্তাভাবনা পছন্দ করে না, এ তেমন কোন অসাধারণ কথা নয়। সব উদ্যোগকে সকলে পছন্দ করে না। দুচারজন করে, দুচারজন করে না। এতো দুনিয়ার নিয়ম, কিন্তু ভুল তো হয়েই গিয়েছে, এখন পস্তালে কি হবে। মনে করেছিলুম আমি ভুল করেছি, 'ভারত' মাপ করে দেবে; কিন্তু জাগরণের তৃতীয় সংখ্যায় ভারতের সম্পাদক পণ্ডিত নন্দদুলারে বাজপেয়ী আমার সেই লেখার যে উত্তর দিয়েছেন, সেটা পড়ে আমার খেদ দূর হয়েছে। তিনি ইটের উত্তর পাটকেলে নয়, বোমা দিয়ে দিয়েছেন। এতে আমার বাস্তবিক পরিতোষ হয়েছে। আমি বুঝতে পারলুম যে আমিই কেবল ক্ষুব্ধ হতে জানি না. এই কলায় আমার চেয়েও বড়ো শিল্পী আছেন। বাজপেয়ী লিখছেন

"প্রেমচন্দজীর উপন্যাসে তাঁর প্রোপাগ্যাণ্ডা বৃত্তির জন্য যথেষ্ট বদনাম আছে এবং হিন্দীর বড় বড় সমালোচকরা এর জন্য অভিযোগ করেছেন।···প্রেমচন্দের সব সমালোচকরা জানেন যে তাঁর সবচেয়ে বড় দোষ যা তাঁর সাহিত্য-

শিল্পকে কলুষিত করে, তা হল—এই প্রোপাগ্যাণ্ডা।" এটা বুক জ্বালানো শব্দ যা বোধ হয় বহুদিন ধরে জাঁকিয়ে বসেছিল ও এই সুযোগ পেয়ে পূর্ণবেগের সঙ্গে আঘাত হানতে চাইছে। এর কী উত্তর দেওয়া যায়। সব লেখকরা কিছু না কিছুর প্রোপাগ্যাণ্ডা করেন—সামাজিক, নৈতিক বা বৌদ্ধিক। যদি প্রোপাগ্যাণ্ডা না থাকে তাহলে জগতে সাহিত্যের প্রয়োজনই থাকে না। যে প্রোপাগ্যাণ্ডা করতে পারে না সে চিন্তাশূন্য; এবং তার হাতে কলম ধরার কোন অধিকার নেই। আমি সেই প্রোপাগ্যাণ্ডাকে গর্বের সঙ্গে স্বীকার করি। আমার বিরোধ তো সেই প্রোপাগ্যাণ্ডার আক্ষেপের বিরুদ্ধে যা মান ও যশ, কীর্তি ও সম্পত্তির মোহের জন্য করা হয়। যে ব্যক্তি জীবনে একবার সাহিত্য সম্মেলনে বা সভায় যোগদান করার অপরাধ করেনি, যে প্ল্যাটফর্মকে শূলের কাঠ মনে করে, তাকে আত্মপ্রচারকারী বলা উচিত নয়। এমনিতে এখানে কোন অভিযোগের ভয় নেই, যে আক্ষেপ করতে চায় করতে পারে। বাজপেয়ীজী মনস্তত্বের ছাত্র হিসেবে আমার সেই লেখায় আমার প্রোপাগ্যাণ্ডা বৃত্তি দেখে সন্তোষ লাভ করলেন, আমার পক্ষে এটা আনন্দের কথা।

একটি অভিযোগ প্রমাণ হয়ে গেল। এবার দ্বিতীয় অভিযোগ শুনুন। অভিযোগের ফর্দ বেশ লম্বা—

"ভারত সম্বন্ধে এত মতামত পড়ে আমার কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষোভ হল না (হ্যাঁ, ক্ষোভ তো আপনার এত হল যার কল্পনা আমি স্বপ্নেও আশা করিনি, কম সে কম এই চিন্তা থেকে যে আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ও সেই ঘাটে পৌঁছাতে মাত্র আট বছর বাকি যে বয়সে বুদ্ধি-শুদ্ধি হ্রাস পায়) কারণ তাতেও আমার কাছে প্রেমচন্দজীর উপন্যাস শিল্পের একটি রহস্য দেখা দিল। উপন্যাস লেখার পুরনো পদ্ধতি ছিল এক পক্ষকে পরম ধার্মিক, বীর বরেণ্য বানিয়ে অপর পক্ষকে তার চরম বিপরীত করে দেওয়া এবং এই দুই বিরোধী দলের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কথার বিকাশ হতে থাকুক। এটা খুব পুরনো পথ ছিল যাতে সত্যের দিকে চোখ বন্ধ করে উপন্যাসের কাঠামো খাড়া করা হত। ...যোগাকে আধুনিক কালের সমৃদ্ধ সাহিত্য বহুদিন পূর্বে ত্যাগ করেছে।"

এর মানে হল আমি সেই পুরনো গোঁড়ামির পথ ধরে চলেছি ও 'ভারত'-এর যশস্বী সম্পাদক নূতনের চেয়ে নূতন সাহিত্যের আপটুডেট সবজান্তা—

ইউরোপের প্রেস থেকে বেরনো মাত্র উপন্যাস সাহিত্যের বই তার কাছে চলে আসে এবং তিনি সেগুলিকে সমালোচকের চোখে পড়েন, অন্যদের এই সৌভাগ্য কি করে হবে! এই বহুজ্ঞতা এবং আপটুডেট-পনার বাহুল্যের দরুন উনি 'ভারত'-এ এমন ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রতিপাদন করেন যেটা আমাদের মতো প্রাচীনপন্থীরা বুঝে উঠতে পারে না—এই ভেবে মনকে প্রবোধ দিলে ক্ষুব্ধ হবার প্রয়োজন কেন হত। আমি আমার বন্ধুকে জানিয়ে দিতে চাই যে সত্য ও অসত্যের সংগ্রাম রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বরাবর চলে আসছে ও যতদিন সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকবে, এই সংগ্রাম সাহিত্যের প্রধান ভিত্তি হয়ে থাকবে। মানবের হৃদয় বদলায় না এবং সাহিত্যতত্ত্বেও পরিবর্তন হতে পারে না। হ্যাঁ, সাহিত্য যারা ভাসাভাসা চোখে পড়ে তাদের চোখে নূতন সাহিত্যে এই সংগ্রাম নজরে নাও পড়তে পারে কারণ নূতন সাহিত্যসেবীরা পুরোনো নকশা ব্যবহার করেও নবীন আবিষ্কারের গৌরব পাবার জন্য ধোঁকার টাটি খাড়া করে থাকে। আর যারা ওপরে ওপরে ভাসে তারা এরকম ধোঁকায় পড়লে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সাহিত্যে ক্ষেত্র হল সৌন্দর্যের সৃষ্টি আর সৌন্দর্য হল সম্বন্ধবাচক। সুন্দরের কল্পনা অসুন্দর ছাড়া হতে পারে না। সেই প্রকার যেমন আলো অন্ধকারের সম্বন্ধ ব্যক্ত হতে পারে। আমিও আমার রচনাগুলিতে এই সংগ্রামকে গুপ্ত রাখার চেষ্টা করেছি যাতে আমিও নবীন আবিষ্কারের গৌরব পাই, আর আমাদের বন্ধু যদি আমার কোন উপন্যাস পড়ে থাকতেন তা হলে এই রকম অসঙ্গত কথা বলতেন না। হতে পারে খুব বড় সমালোচক তার কাছে অভিযোগ করে থাকবেন কিন্তু তিনি নিজে আমার কোন রচনা পড়ার কষ্ট স্বীকার করেননি, এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। কোন রচনা না পড়ে তার সমালোচনা করা আজকালকার ফ্যাসন এবং এসম্বন্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত করতে চাই না।

এরপর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ 'ভারত' সম্পাদকের স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে যেটাতে তিনি সপ্তম আসমানে বসে জমিতে যে ক্ষুদ্র প্রাণীরা পা ঘষে তাদের প্রতি দয়া-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তার বাণী হল—

"সাহিত্যে আমরা বিশুদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতি চাই, সাহিত্যের কোন প্রবন্ধ হোক, বই হোক বা সংস্থা হোক,— আমরা তার পরখ আমাদের এই মূল

ভাবনার কষ্টিপাথরে করে থাকি। আমরা যদিও হিন্দী সম্মেলনের বিপক্ষে তা এইজন্য যে বাস্তবে ওটা সাহিত্য-সম্মেলন নয়…” //

কত শুদ্ধ সাহিত্য-সুধা-বৃষ্টি! অহংকারের এক মহান কুটিল রূপ, সংখ্যালঘুর গৌরবময় শ্রেণীতে থাকা, তার সংখ্যা যত পরিমিত হোক না কেন। সব বড় বড় চিন্তা-প্রবর্তকরা তাদের এ কলার বাণীতে জগৎ জয় করেছেন এবং যদি আমাদের যোগ্য 'ভারত' সম্পাদক সেই গৌরবের উমেদার হন তা হলে আমাদের অভিযোগ করার কিছুই নেই। আমরা সকলে চাই, যে কেউ এমন কোন কথা বলে যা অন্য কেউ বলতে পারে না, এমন কোন কাজ করে দেখাক যা অন্যে পারে না। কখনও এই ইচ্ছা সংস্কার হয় কখনও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রেরিত। আমরা এটাকে বাজপেয়ীজীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও উজ্জ্বল প্রতিভার প্রমাণ মনে করি। তিনি হিন্দীর কোন লেখককে পছন্দ করেন না, এই কথায় আমি আশ্চর্য হই না। তিনি এর চেয়েও কোন বিচিত্র, নূতন, অভূতপূর্ব কথা বলুন, আমি এতটুকুও আশ্চর্যচকিত হব না, টু শব্দ করব না। এতবড় আবিষ্কারকে উপেক্ষা কে করবে, হিন্দীতে এমন কোন লেখক নেই যার আত্মকথা লেখার মতো। এখানে তো সকলেই আত্ম-প্রচারের উপাসক! মাত্র একটা ব্যতিক্রম, আর তিনি হলেন 'ভারত'এর সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত নন্দদুলারে বাজপেয়ী এম. এ.। আশ্চর্যের কথা তিনি 'ভারত'-এর সম্পাদক হতে কেন রাজি হলেন. কারণ সম্পাদকত্বে আত্ম-বিজ্ঞাপন ঠেসে ভরা থাকে। এমন জ্ঞানী পুরুষের জন্য তো কোন গুহা অধিক উপযোগী জায়গা হত। পথ ভুলে গেলেন কি করে! কথা হল তার অন্তর-আত্মা স্বীকার করুক বা না করুক, কিন্তু তার লেখায়, টিপ্পনীর এক-একটি শব্দ থেকে ফুটে বেরোয় আর যেহেতু তিনি তার লেখাগুলিকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করেন, সেই জন্য আমি যখন আমার বিরোধী মত প্রকাশ করলুম তখন সেটা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়ল। অহংকার আমাদেরও আপনার মতো ব্যক্তির চেয়ে কতো মহান পুরুষকে হাস্যাস্পদ করেছে। চমকিত হবার মতো কথা নয়।

এরপর উনি সপ্তম আকাশের চেয়ে ওপরে উড়ে গিয়েছেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্রের পবিত্রতার বিষয়ে জ্ঞানে ভরা কথা বলেছেন। আমরা তার এক একটি কথা স্বীকার করি। নিসন্দেহে, সাহিত্য হল সাত্ত্বিক জীবন। নিশ্চয়ই, সেটি কঠোর তপস্যা ও মহান যজ্ঞ। কিন্তু কেউ যদি

সূত্রাকারে কথা বলে যেটা বুঝে নেবার জন্য কোন দার্শনিকের কাছে যেতে হয়, তা হলে কি করা যায়? আগে কথা বোধগম্য হওয়া চাই। উদাহরণ-স্বরূপ এই বাক্যটি নিন—

"যেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোন স্বতন্ত্র বিষয় থাকে না, সেটাই হল উচ্চ-সাহিত্যের ভাবভূমি। সেখানে অপরিগ্রহের সাম্রাজ্য, ফোটো ছাপা হয় না। সেখানে বাণী মৌন থাকে, গাথা গাওয়াকে সুখ মনে করে না। উচ্চস্বরের যত ক্রিয়াকলাপ হয়, আত্মপ্রেরণাতে হয়।"

যেখানে বাণী মৌন থাকে, সেই হল সাহিত্য? সেটা সাহিত্য নয়, মূকত্ব! সাহিত্যের কাজ হল ভাবগুলিকে অন্তঃকরণে উপলব্ধি করাই নয়, সেগুলিকে ব্যক্ত করা। সেই মনোভাবকে তখনই সাহিত্য বলা হয় যখন সেগুলি ব্যক্ত হয়ে যায়, বাণীতে প্রকাশ পায়। তুলসীদাস রামায়ণের দ্বারা তার আত্মাকে ব্যক্ত করেছেন নতুবা তার নামও কেউ জানত না। এই শাব্দিক ধাঁধাই 'ভারত'-এর সাহিত্যিক লেখার বৈশিষ্ট্য, যার কোন অর্থ হয় না। যদি বাণী মৌন থাকাকেই সুখ মনে করত, তা হলে আজ জগতে সাহিত্য শব্দের অস্তিত্বও থাকত না।

এই বাক্যের সোজা অর্থ যা আমরা বুঝতে পেরেছি, সেটা মনে হয় এই যে, সাহিত্যিকদের আত্ম-বিজ্ঞাপন করা উচিত নয়, এটা সকলের পক্ষে নিন্দনীয় ও সাহিত্যিক জীবদের পক্ষে তো আরো বেশি। এটা মানতে কারো ভিন্ন মত হতে পারে না। কিন্তু আত্মকথা ও আত্ম-বিজ্ঞাপন কি সমান? অল্পবিস্তর ভাল মন্দ অভিজ্ঞতা সব প্রাণীদের জীবনে হয়ে থাকে। যারা সাহিত্যের রুক্ষ ক্ষেত্রে এসে তাদের তনুমন ক্ষীণ করে, তারা কেবল আত্ম-বিজ্ঞাপনের জন্য লালায়িত নয়। আপনি নিজের দার্শনিক গাম্ভীর্যের দরুন তাদের যতই পতিত মনে করুন না কেন, কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে যে কেউ আসে সে নিজের প্রেরণার জন্যই আসে। পরম পদ লাভ করে কি করে না সেটা স্বতন্ত্র কথা। স্কুলে সব ছাত্রেরা গান্ধী বা গোখলে হয়ে যায় না, আর সকলে 'ভারত'-এর সম্পাদকও হয় না, কিন্তু একথা যদি বলা হয় যে তারা বিদ্যা-ভ্যাসের অভিনয় করতে আসে, তার উত্তরে মৌন থাকাই সমীচীন; আমরা এ দাবি করিনি যে 'হংস'-এর 'আত্মকথাঙ্ক' অমর সাহিত্য হয়ে দাঁড়াবে। আমরা যদি এরূপ স্পর্ধা করতুম তা হলেও—যেহেতু আমরা প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট—'ভারত' সম্পাদকের মতো মনস্বী পুরুষের উচিত ছিল আমাদের দাবি

উপেক্ষা করা। কিন্তু সাহিত্যের জঞ্জাল থেকেও অমর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। অমর সাহিত্য রচনা করার বাসনা নিয়ে কেউ অমর সাহিত্য রচনা করতে পারে না। যাদের ওপর ঈশ্বরের কৃপা হয় সেই এ পদ পায়। আমরা তো বলি যে একজন সাধারণ মজুরের জীবন খুঁজলে কিছু এমন কথা পাওয়া যাবে যা অমর সাহিত্যের বিষয় হতে পারে। কেবল দেখার চোখ ও লেখার কলম চাই। এর পরে তিনি এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন—

'আমাদের দেশে আত্মকথা লেখার ঐতিহ্য ছিল না। এখানকার দার্শনিক সংস্কৃতিতে তার বিধান নেই। এখানকার সন্তরা হিমালয়ের গুহায় অবস্থান করে বিশ্বশক্তিকে সমৃদ্ধ করত ও করছে। প্রাচীন ভারত আপন ইতিবৃত্ত ও আপন আত্মকথা নষ্ট করে আজ চিরজীবনের রহস্য বলে দিচ্ছে ও যারা গাথা লিখল তারা বিলীন হয়ে গেল। এ যুগের মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী আত্মকথা লিখেছেন। তার মোদ্দা কথা হল প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ সেটা কেবল ঋণাত্মক যোজনা কিন্তু প্রেমচন্দজী কেমন আত্মকথা লিখছেন, সেটা বলে দেবার দরকার নেই।"

আবার সেই শূন্য শব্দাডম্বর, সেই ধাঁধাভরা কথা, যেগুলি শুনতে গূঢ় কিন্তু বাস্তবে নিরর্থক। ভারতের দার্শনিক সংস্কৃতিতে সংবাদপত্রের বিধান তো নেই। তাহলে আপনি 'ভারত'-এর সম্পাদনা কেন করছেন? প্রাচীনকালে 'এমন অনেক কিছু ছিল যা এখন নেই আর অনেক কিছু ছিল যা এখন আছে। তখন কেউ ইংরেজির এম.এ.ও হত না। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি আপনার নামের পরে বাজপেয়ী ও এম.এ.র উপাধি কেন লেখেন? কেবল আত্মবিজ্ঞাপনের জন্য, না, এর অন্য কোন রহস্য আছে? ভারতের সন্তরা হিমালয়ে অবস্থান করলেন কিন্তু অমর সাহিত্যের সৃষ্টিও করে গেলেন, তা না হলে আজ আপনি উপনিষদ্, বেদ, রামায়ন ও মহাভারতের দর্শন পেতেন? কালিদাসও মাঘ, ভাস ও বাণ সাহিত্য রচনা করেছিলেন, না করেননি? না তাঁরাও শেষ হয়ে গেলেন? কিভাবে তাদের'নামে আত্ম-বিজ্ঞাপনের ইচ্ছুকজনেরা বই লিখে ফেলল? প্রাচীন ভারত তার আত্মকথা নষ্ট করেনি, কখনও করেনি, তার আত্মকথা আজও সূর্যের মতো জাজ্বল্যমান। হ্যাঁ, তার রূপ আজকের মতো ছিল না। তারা তাঁদের আত্মকথা মন্ত্রে, শ্লোকে ও আত্মানুভূতি রূপে লিখল। আমরা আজ গদ্যে সরাসরি লিখছি। সাহিত্যে কল্পনাও

থাকে আর আত্ম-অভিজ্ঞতাও থাকে। যেখানে আত্ম-অভিজ্ঞতা যত বেশি থাকে, সেই সাহিত্য তত বেশি চিরস্থায়ী হয়। আত্মকথার অর্থ হল আত্ম-অভিজ্ঞতা লেখা তাতে কল্পনার লেশমাত্র থাকবে না। বড় বড় লোকের অভিজ্ঞতাও বড় বড়। কিন্তু জীবনে এমন অনেক উপলক্ষ আসে যখন ছোটদের অভিজ্ঞতায় আমাদের কল্যাণ হয়। ছুঁচের কাজ তরবারি দিয়ে হতে পারে না।

এর পর আমাদের সহযোগী এক অত্যন্ত বিতর্কমূলক কথা বলেছেন, শুনুন—

"সাহিত্যকে যারা কেবলমাত্র বাণী-বিলাস মনে করে তার উপযোগিতা-বাদের দোহাই দিতে পারে, যেমন শ্রীযুত প্রেমচন্দজী স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নাম করে দিয়েছেন, কিন্তু আমরা তো সেটাকে অত্যন্ত সাধারণ ধরনের ধারণা মনে করি। লৌকিক উপকারই সাহিত্যের নিকষ নয় ও তা সাহিত্যিকের বিকাশে সহায়ক হতে পারে না। নীতিপূর্ণ দোহা লেখার দিন শেষ হয়েছে। এখন হিন্দী লেখকদের নিজের সংস্কারও নিজের সাধনার প্রয়োজন আছে। অন্যদের উপকার করার পণ তাঁরা পরে এক সময় করবেন। আর এই সাধারণ পরোপকারী দৃষ্টিভঙ্গিতেও আত্মকথা লেখার মতো যোগ্য হিন্দীতে ক'জন আছেন। এমন ক'জন মহচ্চরিত্র আছেন যাদের জীবনচরিত্র হিন্দী জনগণের পথের নিয়ামক হতে পারে।"

এই কথাগুলির কি উত্তর দেওয়া যায়? যদি কেউ বলতে থাকে যে জগতে অন্ধরাই বাস করে, তাহলে তার উত্তরে কি বলা যায়। একজন তার জীবনের তত্ত্ব আপনার সামনে পেশ করছে, তার আত্মার সংশয় ও সংগ্রামের কথা লিখে, আপনাকে তার অতীতের কথা বলে নিজের চিত্তকে শান্ত করতে চায়, আপনার কাজে নিবেদন করে তার উদ্যমগুলি, ঔচিত্য সম্বন্ধে মতামত নিতে চায় আর আপনি বলেন যে এটা বাণী-বিলাস। বাণী-বিলাস আত্মকথা লেখা নয়, চুটকি গল্প বলা, নায়িকার শৃঙ্গার বর্ণনা করা। নিজের হৃদয় পটকে, নিজের খাওয়া হোঁচটগুলিকে, নিজের পরাজয়গুলিকে প্রকাশ করা যদি বাণী-বিলাস হয়, তাহলে সাহিত্য বাণী-বিলাসই, এছাড়া আর কিছু নয়।

বাকি রইল সাহিত্যের উপযোগিতার কথা। সাহিত্যের মূলাধার সত্য, সুন্দর ও শিব। সাহিত্যের সামগ্রী হল মানুষের জীবন। কখন কখন চর ও

অচর জীবনও। কিন্তু তারও তো একটা উদ্দেশ্য থাকবে। জগতের মহান পুরুষেরা সাহিত্য রচনা কেন করলেন? কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই? আমরা তাদের এত মিথ্যাবাদী মনে করি না। কেবল নিজের আত্মার শান্তির জন্য? এর জন্য লেখার প্রয়োজন ছিল না। সাহিত্যের জন্ম উপযোগিতার চিন্তার কাছে ঋণী। চতুর শিল্পী উপযোগিতাকে সাফল্যের সঙ্গে গুপ্ত রাখতে সফল হয়, যে এতখানি চতুর নয় সে উপদেশক হয়ে দাঁড়ায় ও নিজেকে হাস্যাস্পদ করে। উপযোগিতা মানসিক, দার্শনিক, ব্যবহারিক বা কেবল চিত্ত বিনোদনকারী হতে পারে। প্রধানত ভাবের সংস্কৃতিই তার গৌরব। যে বাণী, পুস্তক বা প্রবন্ধে উপযোগিতার উপাদান নেই, সেটা সাহিত্য নয়, কিছুই নয়। 'গীতাঞ্জলি'কে তো সাহিত্য বলবেন? টলস্টয় তো সাহিত্য রচনা করেছিলেন? তুলসী ও সুরদাস সাহিত্য রচনা করেছিলেন? তার কি কোন উপযোগিতা নেই? এখন রইল এই কথা যে হিন্দীতে এরকমের লেখক কতজন আছেন, যাদের জীবনচরিত হিন্দীভাষী জনগণের পথ-নিয়ামক হতে পারে। ইনি মনে করেন একজনও না, আমি মনে করি আমার বাড়ির মেথরেরও জীবনেও কিছু এমন রহস্য আছে যার থেকে আমরা আলো পেতে পারি। অন্তত এইটুকু যে মেথরের সাহিত্যিক বুদ্ধি নেই, লেখকের মধ্যে বিবেচনার শক্তি থাকে। সাহিত্যিকের বিকাশের আর কি উপায় আছে? নিজের অভিজ্ঞতা বা অন্যদের অভিজ্ঞতা! কোন মানুষেরই জীবন এত তুচ্ছ নয় যে মহচ্চরিতরা তার মধ্যে চিন্তার কোন না কোন সামগ্রী পাবেন না। মহচ্চরিত্রের গঠন এই প্রকারে হয়ে থাকে। জঙ্গালের ওপর থেকে ফুল তুলে নেওয়াকে নিষিদ্ধ বলা যায় না। একজন মহাত্মাকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল-- আপনি এত বুদ্ধিমান হলেন কি করে? সে উত্তর করে-- মূর্খদের সঙ্গে থেকে।

এই পর্যন্ত তো ওপরের কথা হল। এবার তত্ত্বের কথা শুনুন। শ্রীবাজপেয়ীজী বলছেন—

"পরন্তু যখন 'হংস'-এর তরফ থেকে লেখা হল যে আত্মকথা সংখ্যা তো বেরোবেই, তখন আমি উপযুক্ত টিপ্পনী লিখেছিলুম যেটাতে রেগে প্রেমচন্দজী লিখছেন যে 'হংসে'র আমার মতামতের প্রয়োজন নেই। প্রেমচন্দজী যদি সাহিত্যিক শিষ্টাচার পালন না করতে পারেন·· তাহলে এরূপ না করলে তাঁর অসহিষ্ণুতা যে অসত্য ও অসভ্য রূপ ধারণ করে, তাতে অন্যদের

নয়, তাঁকে ও তাঁর পত্রিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে—এর আশঙ্কা আছে।"

আশ্চর্যের কথা 'জাগরণ'এর অনুদ্বেগশীল সম্পাদক মহাশয় এই পংক্তিগুলি পড়ে কোন টিপ্পনী লেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না। উনি আমাকে একটি পরামর্শ দিচ্ছেন, আমি বলছি আপনার পরামর্শের আমার প্রয়োজন নেই, আমার যা ইচ্ছা হবে, তাই করব। আমি আপনার পরামর্শ মানতে বাধ্য নই। আপনি আত্মকথা সংখ্যা প্রকাশ করার বিরোধিতা করলেন। আপনার মতোই বুদ্ধি ও বিবেকবান অনেক ভায়েরা আত্মকথা সংখ্যা প্রকাশ করার সমর্থন জানালেন। যদি অশিষ্টতা না হয়, তাহলে আমি 'জাগরণ'-এর সম্পাদককেও সমর্থনকারীদের মধ্যে রাখতে পারি। আমি স্বীকার করি যে এত রুক্ষভাবে আমার সেই বাক্য লেখা উচিত ছিল না। এর জন্য খেদ আছে, এবং অনেকখানি পরিতোষ হয়ে যাবার পর এখনো আছে। কিন্তু একথা বলা যে আমরা আপনার কথা মানি না, কঠোর হওয়া সত্ত্বেও ততখানি কঠোর নয়, যতখানি একথা বলা যে তুমি মিথ্যাবাদী ও অসভ্য এবং এর ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু অহংকার যখন আঘাত পায় তখন মানুষ সংযত থাকার চেষ্টা করলেও রেগে কিছু বলেই ফেলে। শেষে আমরা শ্রীযুক্ত নন্দদুলারে বাজপেয়ীর কাছে নম্রতার সঙ্গে নিবেদন করছি যে আমার তো ভালমন্দ করে কোন প্রকারে কেটে গেল, সম্পত্তি হাতে এল না, যদিও চেষ্টা অনেক করেছি এবং এখন এই চিন্তায় আছি যে কোন মালদার অভিজাত যদি জোগাড় করতে পারি তাহলে তাকে কোন রচনা উৎসর্গ করে দি, কিন্তু আপনার অনেক কিছু করার আছে, অনেক কিছু শেখার আছে, অনেক কিছু দেখার আছে। আদর্শ খুব ভাল জিনিস, কিন্তু জগতে বড় বড় আদর্শবাদীদেরও কিছু না কিছু ঝুকতেই হয়। এটা মনে করবেন না যে আপনি যা কিছু বোঝেন তাই সত্য, অন্যরা একেবারে বোকা। মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যাদের সঙ্গে মতভেদ তাদের নীচ মনে করবেন না। যাকে আপনি নীচ মনে করবেন, সে আপনাকে পুজো করবে। এবার রাগ ফেলে দিন। আর রাগ করে মনকে শান্ত করে নিলেন, আপনার রাগার আনন্দ উপভোগ করে আমি মনকে শান্ত করে নিলুম। আসুন, হাত মিলিয়ে নেওয়া যাক্।

মার্চ ১৯৩৩

দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন

দিলফিগার এক কাঁটাভরা গাছের নীচে বসে তার জামার অগ্রভাগ ছিন্ন করে অশ্রুপাত করছিল। সে সৌন্দর্যের দেবী অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী দিলফরেবের সাচ্চা ও প্রাণপাতকারী প্রেমিক ছিল। সে সেরকম প্রেমিকদের মতো ছিল না, যারা সুবাসে বাসিত হয়ে ও জাঁকজমকযুক্ত বস্ত্রে সেজে প্রেমিক হওয়ার দম্ভ প্রকাশ করে। সে ছিল সাদাসিধে ভাল মানুষ—প্রেমিকের মতো যারা বনে জঙ্গলে ও পাহাড়ে পর্বতে মাথা খোঁড়ে ও ফরিয়াদ করে বেড়ায়। দিলফরেব তাকে বলেছিল যে তুমি যদি সাচ্চা প্রেমিক হও তাহলে যাও আমার জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য বস্তু নিয়ে দরবারে হাজির হও। তখন আমি তোমায় আমার গোলামীতে স্বীকার করে নেব। যদি তুমি সেই বস্তু না পাও তাহলে খবরদার আর এ মুখো হয়ো না, হলে তোমায় শূলে চড়িয়ে দেব। দিলফিগারকে তার মনের কথা বলার, অনুযোগ করার, প্রেমিকার সৌন্দর্য দর্শন করার এতটুকু অবসর দেয়া হলো না। দিলফরেবের এই ফয়সালা শোনামাত্র তার চোবদাররা বেচারা দিলফিগারকে ধাক্কা মেরে বের করে দিল। আর আজ তিন দিন ধরে এই বিপন্ন লোকটি কাঁটাভরা গাছের নিচে সেই ভয়ানক মাঠে বসে ভাবছে কি করা যায় তার কথা। দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য জিনিস কি আমি পাব? অসম্ভব! আর এই জিনিসটিই বা কি? কুবেরের রত্নভাণ্ডার? অমৃত? খসরৌর রাজমুকুট? জামজম? ময়ূর সিংহাসন? পরবেজের সম্পত্তি? না এগুলো কিছুতেই নয়। দুনিয়ায় অবশ্যই এগুলোর চেয়ে দামী, এগুলোর চেয়ে অমূল্য জিনিস আছে। কিন্তু বস্তুটি কি? কোথায়? কি করে পাওয়া যাবে? হে খোদা, আমার মুশকিল কি করে আসান হবে?

দিলফিগার এই চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

মুনীর শামী হাতিমের মতো সাহায্যকারী পেয়েছিলেন। হায়, আমিও যদি কোন সাহায্যকারী পেয়ে যেতুম, হায়! আমায় যদি কেউ বলে দিত দুনিয়ার অমূল্য বস্তুর নাম। সেই বস্তু হাতে না পেলেও যদি জানতে

পারতুম সেই বস্তুটি কি প্রকারের। আমি কলসীর মতো বড় মুক্তোর সন্ধানে যেতে পারি। আমি সমুদ্রের গান, পাথরের হৃদয়, মৃত্যুর শব্দ এবং এগুলোর চেয়েও অস্তিত্বহীন বস্তুর সন্ধানে কোমর বেঁধে লাগতে পারি, কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন! এ বস্তু আমার কল্পনার বহু ঊর্ধ্বে।

আসমানে তারা দেখা দিয়েছিল : দিলফিগার হঠাৎ খোদার নাম করে উঠে দাঁড়াল ও একদিকে রওনা হয়ে গেল। অভুক্ত, পিপাসার্ত, খালি গায়ে, ক্লান্ত, সে বছরের পর বছর বনে জঙ্গলে ও শহরে গ্রামে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ালো। পায়ের পাতা কাঁটায় ঝাঁঝরা হয়ে গেল। শরীর কঙ্কালসার হয়ে গেল। কিন্তু দুনিয়ার সেই সবচেয়ে অমূল্য জিনিসের কোন হদিস পাওয়া গেল না।

একদিন সে পথ হারিয়ে এক মাঠে গিয়ে পড়ল। সেখানে হাজার হাজার লোক দলবদ্ধভাবে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝখানে কয়েকজন পাগড়ি ও চোগাচাপকান পরা দাড়িওয়ালা কাজী অফিসারদের রোয়াকে বসে নিজেদের মধ্যে কিছু শলাপরামর্শ করছিল এবং এই ভিড় থেকে কিছু দূরে এক শূল খাড়া করা ছিল। দিলফিগার কিছুটা দুর্বলতার জন্য ও কিছুটা এখানকার অবস্থা দেখার জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেখলো যে উন্মুক্ত তরবারি হাতে কয়েকজন হাতে পায়ে জিঞ্জির বাঁধা একজন কয়েদীকে ধরে আনছে। শূলের কাছে পৌঁছে সেপাইরা থামলো, কয়েদীর হাতকড়া ও পায়ের বেড়ী খুলে দেওয়া হল। এই হতভাগার হাত শত শত নিরপরাধদের রক্তে রাঙা। সে উপকার ও দয়ার নাম পর্যন্ত শোনেনি। তার নাম ছিল কালাচোর। সেপাইরা তাকে শূলের তক্তায় দাঁড় করিয়ে দিল, মৃত্যুর ফাঁস তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হল এবং জল্লাদেরা যেই তক্তা টেনে নিতে যাবে সেই মুহূর্তে অভাগা অপরাধী চিৎকার করে বললো, খোদার নামে আমাকে ক্ষণিকের জন্য ফাঁসীকাঠ থেকে নামিয়ে দাও, যাতে করে আমি আমার মনের শেষ সাধ মিটিয়ে নিতে পারি। একথা শুনে চারিদিকে স্তব্ধতা ছেয়ে গেল। লোকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল। কাজী ফাঁসীর আসামীর শেষ ভিক্ষা রদ করা উচিত মনে করল না। হতভাগ্য কালাচোরকে কিছুক্ষণের জন্য ফাঁসীকাঠ থেকে নামিয়ে দেওয়া হল।

এই ভিড়ের মধ্যে একটি সুন্দর ভাল মানুষ ছেলে ছড়িতে চেপে লাফিয়ে লাফিয়ে তার ঘোড়া ছুটিয়ে চলছিল। সে তার জগতে এতই মশগুল যেন এই

মুহূর্তে কোন আরব ঘোড়ায় চেপে রয়েছে। তার চেহারা সেই সাচ্চা খুশীতে পদ্মের মতো বিকশিত যা অল্প কিছুদিনের জন্য ছেলেবেলায় পাওয়া যায় ও যার স্মৃতি আমরা মৃত্যুর মুহূর্তে পর্যন্ত ভুলতে পারি না। তার হৃদয়কে এখন পর্যন্ত পাপের কলঙ্ক স্পর্শ করেনি ও নিরীহতা তাকে কোলে করে খেলা করছিল।

হতভাগা কালাচোর ফাঁসীকাঠ থেকে নামল। হাজার হাজার চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। সে ছেলেটির কাছে এল, তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। এই সময় তার মনে পড়ল সেই দিনগুলির কথা যখন সে নিজে এই রকম শান্তশিষ্ট হাসিখুশী ও দুনিয়ায় কদর্যতা থেকে মুক্ত ছিল: মা তাকে কোলে করে খাওয়াতেন, পিতার আনন্দের সীমা ছিল না এবং সারা পরিবার তার জন্য সর্বপ্রকারের আত্মবলিদান করতে প্রস্তুত ছিল। আঃ! কালাচোরের মনে মনে অতীতের দিনগুলির স্মৃতির এত প্রভাব পড়ল যে তার চোখ থেকে, যারা মৃত্যুর শেষ নিশ্বাস নেওয়া লোককে ছটফট করতে দেখেও একটিবারের মতো চোখের পাতা ফেলল না, তার থেকে অশ্রুর একটি বিন্দু ঝরে পড়ল।

দিলফিগার এগিয়ে গিয়ে সেই অমূল্য মুক্তাকে নিজের হাতে তুলে নিল। তার হৃদয় বলে উঠল— নিঃসন্দেহে, এই হল দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন যার জন্য তক্তে তাউস ও জমেজম ও আবে হয়াৎ ও পরবেজের ধন-দৌলত বিসর্জন করা যায়।

এই ভেবে খুশী মনে সাফল্যের আশায় মত্ত হয়ে, দিলফিগার তার প্রেমিকা দিলফরেবের নগর মনোসবাদ-এর দিকে রওনা হল। কিন্তু যেমন যেমন লক্ষ্যস্থলের দিকে যেতে লাগল তার মন হতাশ হতে থাকল এই ভেবে যে, যে বস্তুকে আমি দুনিয়ার সব চেয়ে অমূল্য রতন মনে করেছি দিলফরেব যদি তার কদর না করে তাহলে আমায় ফাঁসী কাঠে চড়িয়ে দেওয়া হবে। আমার আশা পূরণ হবে না। কিন্তু যা হবার হোক। এখন আমার ভাগ্যপরীক্ষা হবে। শেষে পাহাড় ও সমুদ্র পার করে মনোসবাদ শহরে এসে দিলফরেবের দেউড়িতে গিয়ে মিনতি জানাল যে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দিলফিগার খোদার ফজলে তার হুকুম তামিল করে ফিরে এসেছে এবং আপনার পদচুম্বন করতে চায়; দিলফরেব কে তৎক্ষণাৎ তার সামনে ডেকে পাঠাল ও সোনালি পর্দার আড়াল থেকে ফরমাইস করল যে সেই অমূল্য রতন উপস্থিত করো।

দিলফিগার আশা ও ভয়ের এক বিচিত্র অবস্থায় সেই বিন্দু পেশ করল এবং তার পুরো বিবরণ বেশ জোরালো ভাষায় বলে শোনাল।

দিলফরেব পুরা কাহিনী মন দিয়ে শুনল। এবং সেই ভেট হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ মন দিয়ে দেখার পর বলল, দিলফিগার, নিঃসন্দেহে তুমি দুনিয়ার এক অতি মূল্যবান জিনিস খুঁজে বের করেছ। তোমার হিম্মত ও বুদ্ধির তারিফ করছি। কিন্তু এটা দুনিয়ার সব চেয়ে অমূল্য বস্তু নয়। এইজন্য তুমি এখান থেকে যাও এবং আবার চেষ্টা করো। হয়ত এবার তুমি ইপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাবে ও তোমার ভাগ্যে আমার গোলামী জুটবে। আমি আগেই বলে দিয়েছিলুম যে আমি তোমায় ফাঁসী-কাঠে চড়াতে পারি কিন্তু তোমার প্রাণ ভিক্ষা দিচ্ছি এই জন্য যে তোমার মধ্যে সেই গুণ বর্তমান যা আমি আমার প্রেমিকের মধ্যে দেখতে চাই। আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয়ই কোন না কোন দিন সফল হবে।

অসফল ও অসার্থক দিলফিগার প্রেমিকার এই মেহেরবাণীতে একটু সাহস করে বলল—হে হৃদয়েশ্বরী, বহুদিন পরে তোমার দেউড়িতে সিজদা করার সৌভাগ্য হয়। খোদা জানেন আবার কবে এইদিন আসবে। তুমি কি তোমার জন্য প্রাণপাতকারী প্রেমিকের দুর্দশা দেখে দয়া করবে না এবং নিজের রূপের ঝলক দেখিয়ে এই জলন্ত দিলফিগারকে ভবিষ্যতের কষ্ট সহ্য করার বল জোগাবে না? তোমার একটি মত্ত দৃষ্টির নেশায় বুঁদ হয়ে আমি সেই কাজ করতে পারি যা কেউ আজ পর্যন্ত করতে পারেনি।

দিলফরেব প্রেমিকের এই বাসনাভরা কথা শুনে রেগে হুকুম দিল যে এই দেওয়ানা লোকটিকে এখুনি দরবার থেকে বের করে দাও। চৌকিদার তক্ষুণি বেচারা দিলফিগারকে ধাক্কা দিয়ে প্রেমিকার দেউড়ি থেকে বের করে দিল।

দিলফিগার কিছুক্ষণ তার প্রেমিকার নিষ্ঠুর কঠোর ব্যবহারে অশ্রুপাত করল। তারপর কোথায় যাওয়া যায় তার কথা ভাবতে লাগল। বহুকাল এদিক সেদিক ও বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর পর অশ্রুর সেই বিন্দু পেয়েছিল, এখন এমন কি মূল্যবান জিনিস আছে যা এর চেয়েও বেশী দামী হবে? হজরত খিজ্র! তুমি সেকেন্দারকে আবে হয়াতের (অমৃত) কূপের পথ দেখিয়েছিলে, তুমি কি আমায় সাহায্য করবে না? সেকেন্দার সারা দুনিয়ার অধিপতি ছিল! আমি তো ঘরদোর ছাড়া মুসাফির। তুমি অনেক

ডুবন্ত ডিঙ্গিকে কিনারায় এনে তুলেছ, এই গরিবকেও পার করো। হে মহামহিম জিবরীল। তুমিই এই মৃতপ্রায়, দুঃখী প্রেমিকের ওপর সদয় হও। তুমি খোদার বিশেষ দরবারী, আমার মুস্কিল আসান করবে না? কথা হল এই যে দিলফিগার অনেক কাকুতি মিনতি করল কিন্তু তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে এল না। শেষে হতাশ হয়ে পাগলের মতো সে আবার একদিকে বেরিয়ে পড়ল।

দিলফিগার পুব থেকে পশ্চিম ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত না জানি কত বনজঙ্গল ও জনবসতিহীন জায়গায় ঘুরে বেড়াল। কখনও বরফে ঢাকা পাহাড় চূড়ায় ঘুমাল। কখনও ভয়ানক উপত্যকায় ঘুরলো কিন্তু যে জিনিসের জন্য সে পাগল তার সন্ধান পেল না। তার শরীর অস্থিচর্মসার হয়ে দাঁড়াল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে এক নদীর কূলে দুঃখিত হৃদয়ে পড়ে ছিল। চৈতন্য ফিরে আসার পর চমকে উঠে সে দেখল চন্দনের এক চিতা তৈরি করা হয়েছে এবং এক যুবতী সোহাগের জোড় পরে সেজেগুজে তার উপর বসে আছে। তার উরুর উপর রয়েছে তার প্রিয় স্বামীর মাথা। হাজার হাজার লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও পুষ্প বর্ষণ করছে। হঠাৎ চিতা থেকে আপনা আপনি এক শিখা দেখা দিল, সতীর চেহারা সেই মুহূর্তে এক পবিত্র ভাবে আলোকিত হয়ে উঠছিল। চিতাগ্নির পবিত্র শিখাগুলি তার গলা জড়িয়ে ধরল ও ক্ষণিকের মধ্যে সেই ফুলের মতো কোমল শরীর ভস্মস্তূপে পরিণত হল। প্রেমিকা প্রেমিকের জন্য আত্মোৎসর্গ করল, দুজন প্রেমীর সাচ্চা, পবিত্র, অমর প্রেমের শেষ লীলা দৃষ্টি থেকে অন্তর্নিহিত হয়ে গেল। সকলে বাড়ি ফিরে গেলে দিলফিগার নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল এবং তার ছেঁড়া জামার আঁচলে সেই ছাই তুলে নিল। এই এক মুঠো ভস্মকে দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রত্ন মনে করে সাফল্যের নেশায় বুঁদ হয়ে প্রেমিকার উদ্দেশ্যে রওনা হল। এবার গন্তব্য স্থল যতই কাছে আসতে লাগল, তার সাহস ততই বাড়তে থাকল, তার অন্তরাত্মা বলছিল—এবার তোমার জিৎ হবে। তার এই সময়কার মনের কথা বলা বৃথা। শেষে সে মনোসবাদ শহরে প্রবেশ করল ও দিলফরেবের উঁচু দেউড়িতে পৌঁছে খবর দিল যে দিলফিগার সফল হয়ে ফিরে এসেছে। সে হুজুরের সামনে উপস্থিত হতে চায়। দিলফরেব জাহাঁবাজ প্রেমিককে তক্ষুণি দরবারে ডেকে পাঠাল এবং দুনিয়ার সেই অমূল্য রতনের জন্য হাত পেতে দিল। দিলফিগার সাহস করে তার

রক্তশুভ্র মনিবন্ধন চুম্বন করল এবং একমুঠো ভস্ম তার হাতে দিয়ে সমগ্র কাহিনী হৃদয়দ্রাবক ভাষায় শোনাবার পর সুন্দরী প্রেমিকার মুখে আপন ভাগ্যের শুভ রায় শোনার জন্য অপেক্ষা করে রইল। দিলফরেব সেই একমুঠো ছাই তার চোখে স্পর্শ করাল ও কিছুক্ষণ চিন্তার সাগরে ডুবে থাকার পর বলল—হে প্রাণোৎসর্গকারী প্রেমিক দিলফিগার, তুমি যে ভস্ম এনেছ তা পরশ পাথরের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। দুনিয়ার খুবই অমূল্য জিনিস এবং আমি অন্তরের সঙ্গে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ যে তুমি আমাকে এই অমূল্য ভেট দিয়েছ। কিন্তু দুনিয়ায় এর চেয়ে অমূল্য কোন বস্তু আছে। যাও, তাঁর খোঁজ কর, তারপর আমার কাছে এসো। আমি অন্তর দিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি খোদা যেন তোমায় সফল করেন। এই কথা বলে সে সোনালি পর্দার বাইরে এসে প্রেমিকার ভঙ্গিমায় তার রূপের ছবি দেখিয়ে আবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। যেন বিদ্যুৎ চমকালো ও মেঘের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। দিলফিগারের মাথা তখনও ঠিকঠাক হয়নি এমন সময় চোবদার মোলায়েম করে হাত ধরে তাকে প্রেমিকার ওখান থেকে বের করে দিল। এই তৃতীয়বার সেই প্রেমের পূজারী নিরাশার অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকল। দিলফিগার তার সাহস হারিয়ে ফেলল। সে ভাবতো আমি জগতে একান্তই অভাগা, বিফলমনোরথ হয়ে মরার জন্যই জন্মেছি। আর এখন পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ি যাতে প্রেমিকার জুলুমের ফরিয়াদ করার জন্য আমার একটা হাড়ও যেন আস্ত না থাকে। সে দিওয়ানার মতো উঠে দাঁড়াল ও পড়ি-মরি করে এক গগনচুম্বী পাহাড়ের চূড়ায় পৌছাল। অন্য কোন সময় এমন উঁচু পাহাড়ে ওঠার সাহস তার হত না। কিন্তু এখন প্রাণ দেবার উৎসাহে পাহাড় তার কাছে এক সাধারণ টিলার চেয়ে বেশী উঁচু মনে হল না। সে যেই পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে যাবে তক্ষুনি সবুজ পোশাক পরা ও সবুজ পাগড়ী বাঁধা এক বৃদ্ধ হাতে এক জপমালা ও অন্য হাতে লাঠি নিয়ে দেখা দিয়ে সাহস দেবার স্বরে বললেন দিলফিগার, অবুঝ দিলফিগার, কাপুরুষের মতো একি করতে যাচ্ছ? তুমি প্রেম করার দাবি কর, কিন্তু এটুকুও জান না যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রেমের পথের প্রথম ধাপ। মরদ হও, এভাবে সাহস হারিও না। পুবে একটা দেশ আছে যার নাম হিন্দুস্থান, সেখানে যাও, তোমার বাসনা পূরণ হবে।

এই কথা বলে হজরত খিজ্র অন্তর্ধান হলেন। দিলফিগার শুক্রিয়ার (ধন্যবাদের) নমাজ পড়ল ও নূতন উৎসাহে, তাজা জোশে ও অলৌকিক সাহায্যের ভরসা পেয়ে খুশী মনে পাহাড় থেকে নেমে হিন্দুস্থানের দিকে রওনা হল।

না জানি কতদিন ধরে কাঁটাভরা জঙ্গলে, অগ্নি উদ্গিরণকারী মরুভূমিতে, কঠিন উপত্যকায় ও অলঙ্ঘ্য পর্বত পার করে সে হিন্দের পবিত্র সরেজমিতে এসে হাজির হল। ঠাণ্ডা জলের ঝর্ণায় যাত্রার দুঃখ কষ্ট ক্ষালন করে ক্লান্তিতে নদীর কূলে শুয়ে পড়ল। তারপর সন্ধ্যার দিকে সে এক তৃণ বৃক্ষহীন ময়দানে গিয়ে পৌছাল যেখানে অসংখ্য আধমরা ও প্রাণহীন লাশ বিনা কফনে পড়ে আছে, চিল, কাক ও হিংস্র পশু মরে পড়ে আছে ও সারা মাঠখানি রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে দিলফিগারের হৃদয় কেঁপে উঠল। হায় খোদা, কি বিপদেই না পড়লুম।

মৃত্যুপথযাত্রীদের কাতরানি, কান্না ও ছটফট করে প্রাণ দেওয়া, হিংস্র পশুগুলির ভাঙা হাড় ও মাংসপিণ্ড নিয়ে পালানো, এই হৃদয় কাঁপানো দৃশ্য দিলফিগার এর আগে কখনো দেখেনি। হঠাৎ তার খেয়াল হল, এ হল যুদ্ধক্ষেত্র এবং এই লাশগুলি বীর সৈনিকদের। এই সময় কাছেই কাতরানি শোনা গেল। দিলফিগার সেদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল, এক লম্বা-চওড়া লোক যার পুরুষালি চেহারা আসন্ন মৃত্যুর দুর্বলতায় ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, মাটিতে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। বক্ষস্থল থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে কিন্তু ধারালো তরবারিখানির মুঠো তার হাত থেকে পড়ে যায়নি।

দিলফিগার একখানি ন্যাকড়া ক্ষতস্থানে রেখে দিল, যাতে রক্ত পড়া থেমে যায়। দিলফিগার বলল—হে সৈনিক, তুমি কে? এই কথাগুলি শুনে সে চোখ খুলল ও বীরের মতো বলল, তুমি কি জান না আমি কে, তুমি কি আজ এই তরবারির মার দেখনি? আমি আমার মায়ের সন্তান ও ভারতের সুপুত্র। এই কথা বলতে বলতে তার ভ্রুকুঞ্চিত হল। ফ্যাকাশে চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেল, ধারালো তরবারি তার বিস্ময়কর কাজ দেখাবার জন্য জলজল করে উঠল। দিলফিগার বুঝতে পারল যে লোকটি এই মুহূর্তে আমাকে তার শত্রু মনে করছে। সে মোলায়েম স্বরে বলল—হে বীর, আমি তোমার শত্রু নই। আমি আমার দেশ ছাড়া দরিদ্র

মুসাফির। পথ ভুলে এদিকে চলে এসেছি। মেহেরবানী করে এখানকার কথা একটু বুঝিয়ে বল।

একথা শুনে সেই আহত সৈনিক খুব মিষ্টি গলায় বলল—যদি তুমি মুসাফির হও তাহলে এস আমার রক্তে ভেজা পাঁজরায় বসে পড়। এই দুই আঙুল জমি আমার কাছে বাকি থেকে গিয়েছে এবং মৃত্যু ছাড়া আর কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। আফসোসের কথা যে তুমি এখানে এমন সময় এসেছো যখন আমরা তোমার আদর যত্ন করার মতো অবস্থায় নেই। আমাদের বাপ-দাদার দেশ আজ আমাদের হাত থেকে চলে গেল এবং এই মুহূর্তে আমরা দেশহীন। কিন্তু (পাশ ফিরে) আমরা আক্রমণকারী শত্রুকে দেখিয়ে দিয়েছি যে রাজপুতরা নিজের দেশের জন্য কেমন বীরত্বের সঙ্গে প্রাণ দেয়। এই আশেপাশে তুমি যে লাশগুলি দেখছ এগুলি হল তাদের যাদের এই তরবারি দিয়ে যমলোকে পাঠিয়েছি (স্মিত হেসে) এবং যেহেতু আমি দেশহীন, কিন্তু রক্ষে এই যে আমি শত্রুর জমিতে প্রাণত্যাগ করছি। (বুকের আঘাত থেকে ন্যাকড়া বের করে) তুমি কি এই মলম লাগিয়ে দিয়েছো? রক্ত বের হতে দাও, একে থামিয়ে কি লাভ? আমি কি নিজের দেশেই গোলামী করার জন্য বেঁচে থাকব! না, এমন জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া ভাল, এর চেয়ে ভালো মৃত্যু সম্ভবপর নয়।

বীর পুরুষের কথার আওয়াজ থেমে গেল, শরীর শিথিল হয়ে গেল, রক্ত এত বেশী পড়ল যে নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে গেল। কখন সখন একটি বিন্দু ঝরে পড়ত। শেষে সারা শরীর স্তব্ধ হয়ে গেল, হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল, ও চোখ বুজল। দিলফিগার মনে করল যে বীর পুরুষ আর বেঁচে নেই। এমন সময় মৃত্যুপথযাত্রী মৃদু স্বরে বলল—ভারত মাতার জয় হোক। এর সঙ্গে তার বুক থেকে রক্ত বিন্দু ঝরে পড়ল। এক সাচ্চা দেশপ্রেমী ও দেশভক্ত দেশভক্তির কর্তব্য পালন করল। দিলফিগারের মনে এই দৃশ্যের গভীর প্রভাব পড়ল। তার হৃদয় বলল—নিঃসন্দেহে জগতে রক্তের এই বিন্দুর চেয়ে দামী অন্য কোন বস্তু হতে পারে না। সে তক্ষুনি রক্তের বিন্দু, যার সামনে মরণের লালও তুচ্ছ, হাতে তুলে নিল, এবং রাজপুতের বাহাদুরীতে আশ্চর্য হতে হতে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। নানা প্রকারের কষ্ট স্বীকার করে শেষকালে দিলফিগার সফল হয়ে ফিরে এসেছে। সে দরবারে হাজির হতে চায়। দিলফরেবও তাকে সেই

মুহূর্তে হাজির হবার হুকুম দিল। স্বয়ং যথারীতি পর্দার আড়াল থেকে বলল —দিলফিগার, এবার তুমি অনেক দিন পরে ফিরে এসেছো। দাও, দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য বস্তু কোথায় ?

দিলফিগার মেহেদি রাঙ্গা হাতের চেটোতে চুমু খেতে খেতে রক্তের সেই বিন্দু তার ওপর রেখে দিল এবং পুরো কাহিনী প্রত্যয়দৃপ্ত ভাষায় বলে শোনাল। সে যখন বলা শেষ করলো তখুনি হঠাৎ সোনালি পর্দা সরে গেল এবং দিলফিগারের সামনে সৌন্দর্যের একটি সাজানো দরবার দেখা দিল। দরবারের প্রত্যেকটি সুন্দরী জুলেখার চেয়ে অধিক সুন্দরী ছিল। দিলফরেব খুব মর্যাদার সঙ্গে সোনালি মসনদের শোভা বর্ধন করছিল। দিলফিগার যৌবনের এই মায়াপুরী দেখে আশ্চর্যচকিত হল ও চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এই সময় দিলফরেব মসনদ থেকে উঠে দাঁড়ালো, কয়েক গজ এগিয়ে তাকে আলিঙ্গন করল। গায়িকারা আনন্দে গান গাইতে শুরু করল। দরবারীরা দিলফিগারকে নজরানা দিল। চাঁদ-সূর্যের চেয়ে অধিক সম্মানের সঙ্গে তাকে মসনদে বসিয়ে দিল। যখন এই চিত্তমোহক গান বন্ধ হল দিলফরেব উঠে দাঁড়াল, হাতজোড় করে দিলফিগারকে বলল— হে জাঁনিসার প্রেমিক দিলফিগার! আমার আশীর্বাদ নাও। খোদা আমার প্রার্থনা শুনেছেন। তিনি তোমায় সফল ও সুন্দর করেছেন। আজ থেকে তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার দাসী।

এই বলে একটি রত্নখচিত মঞ্জুষা আনিয়ে তার থেকে একটি তখ্‌তী বের করল যাতে লেখা ছিল—

রক্তের সেই শেষ বিন্দু যা দেশ রক্ষার জন্য ক্ষয়িত হয় সেই হল দুনিয়ার সব চেয়ে অমূল্য বস্তু।//

মহাজনী সভ্যতা

মুজদঃ এ দিল কি মসীহা নফসে মী আয়দ ;
কি জে অনফাস খুশশ বূএ কসে মী আয়দ ॥

[হাফিজ]

(হৃদয়, তুই প্রসন্ন হ পীযূষপাণি মুক্তিদাতা তোর দিকে এগিয়ে আসেন সশরীরে। দেখিস্ নাকি জনতার নিঃশ্বাসে কার সুগন্ধ ভেসে আসে।)

সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতায় মজবুত শরীর আর বলিষ্ঠ বাহু জীবনের অত্যাবশ্যক বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হতো আর রাজতন্ত্রে বুদ্ধি, বাক্ নৈপুণ্য আর অবনতশিরে আজ্ঞা পালনই ছিল আবশ্যক উপকরণ। এ দু'য়ের ভিতরেই অবশ্য দোষের সঙ্গে সঙ্গে গুণের অংশও বিদ্যমান ছিল। মানুষের শুভ ইচ্ছা ও সুন্দর অনুভূতিগুলি তখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি।

সামন্ত প্রভু শত্রুর রক্তে পিপাসা মেটালেও অনেক সময়ই বন্ধু বা উপকারীর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জনেও পরাঙ্মুখ হননি। নিজের আদেশকে আইন মনে করতেন সম্রাট, বাদশাহ। তাঁর হুকুম তামিল না করাটা কোনোমতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না তিনি। এ সত্ত্বেও তিনি প্রজাপালন করতেন এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। পররাজ্য আক্রমণের পিছনে থাকত হয় প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষা নয়তো আত্মগৌরব ও প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা কিংবা দেশবিজয়ের আর রাজ্য বিস্তারের বীরোচিত প্রেরণা। প্রজার রক্তশোষণ কোনো সময়ই তাঁর দেশবিজয়ের উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ রাজা এবং সম্রাট কোনো দিনই জনসাধারণকে তাঁর স্বার্থসাধন ও ধনসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যুদ্ধের ইন্ধন বলে মনে করেননি। তাদের সুখে দুঃখে অংশীদার হতেন তাঁরা, সমাদর করতেন তাদের গুণাবলী।

কিন্তু পুঁজিবাদী সভ্যতার গোড়ার কথাই হল অর্থ—সমস্ত কাজের মূলে এক দুর্বার অর্থ পিপাসা, কোন দেশে রাজ্য শাসন প্রতিষ্ঠার মূলেও আছে মহাজন পুঁজিপতিদের ক্রমবর্ধান মুনাফা অন্বেষণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন আজ পুঁজিপতিদেরই রাজত্ব।

মানবসমাজ আজ দুভাগে বিভক্ত। বড় অংশটায় আছে তারা যাদের মৃত্যুই বিধিলিপি ; আর ছোট, খুবই ছোট অংশের মালিক তারা যারা নিজেদের শক্তি আর প্রভাবে বড় অংশটাকে নিজের তাঁবে রেখেছে। জনগোষ্ঠীর এই বিরাট অংশটার জন্য তাদের বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নেই, নেই কোন রকম সুযোগ-সুবিধা দেবার ক্ষীণতম সদিচ্ছা। তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজন কেবল এইজন্য যে, তারা মালিকের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে, বুকের রক্ত জল করবে আর একদিন নিঃশব্দে বিদায় নেবে পৃথিবীর বুক থেকে। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, শাসক শ্রেণীর এই চিন্তাধারা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—অনুপ্রবেশ করেছে শোষিত শ্রেণীর মধ্যেও। ফলে প্রত্যেকেই নিজেকে মনে করছে শিকারী, আর তাদের শিকারের লক্ষ্য হয়েছে সমাজ। সে যেন সমাজ-নিরপেক্ষ—সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সমাজের সঙ্গে যদি কোন সম্বন্ধ একান্তই থেকে থাকে সে শুধু তাকে ধোঁকা দিয়ে, ছলে বলে কৌশলে যতটা সম্ভব মুনাফা দোহন করে নেওয়া।

মানুষের চিন্তা জুড়ে বসে আছে অর্থলোভ—পুরোপুরি গ্রাস করছে সে তার চিন্তার জগতকে। কৌলিন্য, শিষ্টতা, গুণ এবং যোগ্যতার একমাত্র নির্ধারিত নিরিখ হয়েছে—অর্থ। অর্থের মালিক দেবতুল্য ব্যক্তি—যত কলুষিতই হোক না কেন তার অন্তঃকরণ। সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা—অর্থের বেদীতেই সকলেই নতশির। এ বায়ু এত বিষাক্ত যে, এর ভিতর প্রাণধারণ করা ক্রমশঃই কঠিন হয়ে উঠছে। যদি ডাক্তার কিম্বা হেকিম হন, তাহলে লম্বা ফী ছাড়া কথাই বলেন না। উকিল কিম্বা ব্যারিষ্টার হন তো মিনিট মাপবেন মোহরের হিসাবে। গুণ আর যোগ্যতার সাফল্য পরীক্ষা হয় তার আর্থিক মূল্য দিয়ে। মৌলবী কিম্বা পণ্ডিত মশাই পর্যন্ত তাদের পয়সার গোলাম। খবরের কাগজ তারই সুরে বাঁধা। অর্থ মানুষের চিন্তা শক্তিকে এমন করে গ্রাস করে নিয়েছে যে, তার রাজ্যকে কোনো দিক দিয়েই আক্রমণ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। সভ্যতা, স্নেহ, দয়ামায়া এবং সৌজন্যের আধার মানুষ আজ দয়ামায়া শূন্য—প্রাণহীন জড়পদার্থে পরিণত হয়েছে।

পুঁজিবাদী সভ্যতার আজ নতুন নতুন নিয়মের খেলনা আর তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এ সমাজের বনিয়াদ। সে নিয়মাবলীর অন্যতম হচ্ছে সময়ের উপর মূল্য আরোপণ—সময়ই অর্থ। পূর্বে সময়ই ছিল জীবন আর তার শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন ছিল বিদ্যার্জনে কিংবা দীন-দুর্গতদের কল্যাণ সাধনে।

কিন্তু এখন সময়ের শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার অর্থোপার্জনে, অর্থঅন্বেষণে। ডাক্তার বাবুর হাত রোগীর নাড়ীতে কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ ঘড়ির কাঁটায়। এক এক মুহূর্ত যে এক এক মোহরের শামিল! রোগী যদি এক আশরফী নজরানা দিয়ে থাকে তবে তো তিনি তাকে এক মিনিটের বেশি সময় কোনোমতেই দিতে পারেন না। রোগী তার দুঃখের কাহিনী তাঁকে শোনাবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু ডাক্তারবাবুর লক্ষ্য নেই সেদিকে, আগ্রহও নেই বিন্দু মাত্র, তাঁর দৃষ্টিতে লোকটির মূল্য এই পর্যন্ত যে সে তাঁকে ফী দিয়েছে। চট করে প্রেসক্রিপশন লিখলেন। বাস্, তার পরেই আবার অন্য রোগীর উদ্দেশে প্রস্থান। মাস্টারমশাই পড়াতে আসেন—তাঁর এক ঘণ্টা বাঁধা সময়। সামনে ঘড়ি নিয়ে বসেন তিনি, ঘণ্টা হতেই উঠে রওনা হন। ছাত্রের পাঠ আধখানা রইল তাতে মাস্টারমশায়ের কি এসে যায়—তিনি এক ঘণ্টার চাইতে বেশি সময় দেবেন কি? কারণ সময়ই যে অর্থ! এই অর্থলোভ মনুষ্যত্ব আর বন্ধুত্বকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। স্ত্রী, পুত্রকন্যার সঙ্গে কথা বলবার ফুরসত নেই স্বামীর, বন্ধু কিম্বা আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে তো দূরের কথা। যতক্ষণ বসে সে কথা বলবে, ততক্ষণে তো কিছু পয়সা কামিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তাতেই তো জীবনের একমাত্র সার্থকতা—অন্য সব কিছুই নিছক সময় নষ্ট। আহার নিদ্রা বাদ দিলে চলে না, তাই বেচারাকে বাধ্য হয়েই খাওয়া-পরার জন্য এতটা সময় নষ্ট করতে হয়।

আপনার কোন বন্ধু বা আত্মীয় শহরে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাহলে ধরে নিন তাঁর ওখানে ওঠা, থাকা আপনার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাঁর বাড়ি পৌঁছে আপনাকে কার্ড পাঠাতে হবে। ওঁর এখন অনেক কাজ, অনেক কষ্টে আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলবেন আর নয়তো সোজাসুজি বলে দেবেন যে, তাঁর দেখা করবার ফুরসত নেই। এখন তাঁর উপাস্যদেবতা হচ্ছে অর্থ; বন্ধুত্ব এবং সৌজন্য, শিষ্টাচারবোধ কবে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। আপনার কোনো বন্ধু উকিল, আপনার কোনো মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে কোনো সাহায্যের আশা রাখবেন না, অবশ্য যদি তিনি চক্ষুলজ্জার মাথা এখনো না খেয়ে বসে থাকেন তাহলে সম্ভবতঃ তিনি আপনার সঙ্গে দেনাপাওনার কথা তুলবেন না, কিন্তু জেনে রাখুন, আপনার মোকদ্দমার দিকে বিন্দুমাত্র নজর দেবেন না তিনি, প্রকাশ করবেন না বিন্দুমাত্র আগ্রহ। এর চাইতে অনেক ভালো হয় যদি আপনি কোনো

অপরিচিতের কাছে গিয়ে তাকে তার পুরো ফী দেন। ভগবান না করুন আজ যেন কেউ কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে। তাহলে আর তার মধ্যে নামমাত্র মনুষ্যত্ব থাকবে না, তার এক এক মিনিটও বহুমূল্য হয়ে উঠবে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, বাজে খোশ গল্পে সময় নষ্ট করা হোক। কিন্তু একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে, ধনলিপ্সা যেন এতটা বলবতী হয়ে না ওঠে যাতে করে মনুষ্যত্ব, বন্ধুত্ব, স্নেহ, সহানুভূতি সব লোভ পায়।

কিন্তু আপনি এই পয়সার গোলামকে দোষ দেবেন কি করে? সমস্ত পৃথিবী যে প্রবাহে প্রবাহিত সেও সেই ধারার অনুযায়ী। সম্মান, প্রতিষ্ঠা তো চিরদিনই মানুষের অকাঙ্ক্ষিত বস্তু। যখন বিদ্যা শিক্ষা যশপ্রতিষ্ঠা লাভের সাধন ছিল, মানুষ তখন তার সাধনাই করেছে। যখন যশপ্রতিষ্ঠার সাধন হয়েছে ধন, মানুষ তখন একান্ত আগ্রহে, অনন্যমনা হয়ে ধনের আরাধনাতেই নিয়োগ করতে বাধ্য করেছে নিজেকে। সে তো কোনো সাধু মহাত্মা বা সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী নয়। সে কি দেখতে পাচ্ছে না যে, তারই পেশায় সফলতার দুর্গম পথ অতিক্রম করেছেন তার যে সৌভাগ্যবান পূর্বগামী, তিনি ছিলেন সেই রাজপথেরই পথিক যে পথ ধরে আজ সে চলেছে নিজে?

সফলকাম ব্যক্তির পক্ষে সময়ই সম্পদ। সে এই সিদ্ধান্ত দেখতে পাচ্ছে সর্বত্র। আর সে যদি সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাহলে আর তার দোষ কোথায়। যশ, মান, প্রতিষ্ঠার লালসা কিম্বা মোহকে তো নির্মূল করা যায় না মন থেকে। সে দেখতে পাচ্ছে যে, যার অর্থ নেই, তার কোন কদরও নেই। এদের অর্থ নেই কারণ এরা সময়কেই ধন বলে মনে করেনি। সে তার নিজের পেশায় নিপুণ তবু তার কোনো কদর নেই। জীবনকে ভালবাসেন যিনি, তাঁর পক্ষে অসহনীয় এ উপেক্ষা। তাকে চক্ষু লজ্জা, বন্ধুত্ব আর সৌজন্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনায় নিজেকে নিমগ্ন করতে হবে—তবেই না সিদ্ধিলাভ সম্ভব। আর এ তো কোনো ইচ্ছাকৃত কাজ নয়—বাধ্য হয়েই এ করতে হয়। তার মনের ধারা আপনা থেকেই খানিকটা এই ধরনের হয়ে গেছে যে, অর্থোপার্জন ছাড়া তার আর অন্য কোনো কিছুতেই উৎসাহ নেই। যদি তাকে কোনো সভা-সমিতি কিম্বা বক্তৃতার আসরে আধ-ঘণ্টা বসতে হয় তাহলে বুঝবেন তার কয়েদীর অবস্থা। তার সমস্ত মানসিক অনুভূতি ও তার সাংস্কৃতিক ঔৎসুক্য একই বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তা হবেই বা না কেন? তার প্রিয় বন্ধুও নিজের স্বার্থেই এসেছে

তার কাছে। আত্মীয়স্বজনও আজ তার অর্থেরই উপাসক। সে কি জানে না যে, আজ যদি সে দরিদ্র হত, তবে টিকি দেখা যেত না কোনো বন্ধু-বান্ধবের, আত্মীয়-কুটম্বেরাও কি কেউ ছায়া মাড়াতেন তার? তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে—বার্ধক্যের জন্য কিছু সঞ্চয়ও করতে হবে, ছেলেমেয়েদের জন্য যথাযথ বিধিব্যবস্থা করে যেতে হবে। যাতে তাদের জীবনের পথে জায়গায় জায়গায় ঠোকর না খেতে হয়। এই নির্দয় সহানুভূতি-শূন্য দুনিয়ার হাল তার ভালো করেই জানা। সমস্ত আশা উৎসাহ, সাহস উদ্যম যাতে ধূলিসাৎ, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, এমন কঠিন পরিস্থিতির ভিতর পড়তে দিতে চায় না সে নিজের সন্তানসন্ততিকে। জীবনের সমস্ত পথ তাকে একাই অতিক্রম করতে হবে। আর এই পরিক্রমায় তাকে কঠোর সিদ্ধান্ত-গুলি মেনে চলতেই হবে—নান্য পন্থা:

এই সভ্যতার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে—'বিজিনেস ইজ বিজিনেস'—অর্থাৎ ব্যবসা ব্যবসাই, তাতে হৃদয়াবেগের স্থান নেই। প্রাচীন জীবনদর্শনে এমন স্পষ্ট অপ্রিয় কথায়—যাকে প্রায় নির্লজ্জতার শামিল বলা যেতে পারে—স্থান ছিল না। কিন্তু এটাই নবীন চিন্তাধারার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সেখানে চক্ষুলজ্জা, মনুষ্যত্ব, বন্ধুত্বের কোনো স্থান নেই—বিজিনেসে আবার বন্ধুত্ব কি? যখন কেউ চিন্তাধারার আশ্রয় গ্রহণ করল আপনি নিরুত্তর—আপনি আর মুখ খুলতে পারবেন না। কোনো সদাশয় ব্যক্তি বাধ্য হয়ে নিজের কোনো মহাজন বন্ধুর কাছে যান এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মনে মনে আশা, হয়তো সুদের হার খানিকটা কমিয়েও দিতে পারে। কিন্তু যখন তিনি দেখতে পান যে, সেই মহাপুরুষ তাঁর সঙ্গেও ব্যবসায়ী চাল চালাচ্ছেন, তখন তিনি কিছুটা সুবিধা ভিক্ষা করেন। বন্ধুত্ব আর ঘনিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে সজল নেত্রে করুণ স্বরে বলতে থাকেন, "ভাই, আমি এ সময় বড় বিপদে পড়ে এসেছি—নইলে তোমাকে কষ্ট দিতাম না। ঈশ্বরের দোহাই, আমার অবস্থা বুঝে দয়া করো। মনে করো এক পুরনো বন্ধু···।" তার কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে খুব মুরুব্বিয়ানা চালে বলে ওঠে—"বন্ধু তুমি এ-কথাটা ভুলে যাচ্ছ যে, বিজিনেস ইজ বিজিনেস"। সেদিন সেই করুণা প্রার্থীর উপর যেন বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তার আর কিছু বলবার নেই—নেই কোনো যুক্তি। সবার আড়ালে চুপি চুপি সে নিজের পথ দেখে—নয়তো তার কাঠখোট্টা ব্যবসায়ী বন্ধুর সমস্ত শর্তগুলি মেনে নেয়।

এই পুঁজিবাদী সভ্যতা পৃথিবীতে যে সব নয়া রাজনীতির প্রচলন করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক আর রক্তপিপাসু এই ব্যবসায় সম্বন্ধীয় বিধানটি। স্বামী স্ত্রীতে বিজিনেস, পিতাপুত্রে বিজিনেস, গুরুশিষ্যে বিজিনেস্। মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক আর সামাজিক ভালবাসার সম্পর্ক শেষ। ধিক্ এই বিজিনেস! দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কোনো মেয়ে অবিবাহিত থেকে যায়, আর নিজের রুজি-রোজগারের পথ না করতে পারে, তাহলে তাকে দাসী হতে হয় নিজের পিত্রালয়ে। এমনিতেই সব ছেলেমেয়েকেই কিছু না কিছু ঘরের কাজকর্ম করতে হয়, তাতে তাদের কেউ চাকর বলে মনে করে না। কিন্তু পুঁজিবাদী সভ্যতায় মেয়ে কোনো একটা বিশেষ বয়সের পর দাসী হয়ে ওঠে নিজের ভাইদের। পূজনীয় পিতা পর্যন্ত দাস হয়ে ওঠেন পিতৃভক্ত পুত্রের আর মা হন সুপুত্রের দাসী। আত্মীয়স্বজনের তো কথাই নেই—ভাই পর্যন্ত ভাইয়ের গৃহে অতিথি। অনেক সময়ই তাকে আতিথ্যের দেনা মেটাতে হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এই সভ্যতার প্রাণ। নিজে স্বার্থপর হও, সমস্ত কিছুই নিজের জন্য।

কিন্তু এখানেও আমরা কাউকে দোষী করতে পারি না—সেই যশ প্রতিষ্ঠা, সেই ভবিষ্যতের চিন্তা, সেই নিজের মৃত্যুর পরে স্ত্রীপুত্রের জীবনধারণের সমস্যা, সেই ঠাট বজায় রাখবার দুর্ভাবনা, এর বোঝা সকলেরই কাঁধে চেপে রয়েছে অচল, অনড় হয়ে। যে যদি এই সভ্যতার রীতিনীতি না মানে তাহলে তো তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে এই সভ্যতার রীতিনীতি অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাকে বাধ্য হয়ে তার আদর্শের সামনে মাথা নত করতে হয়। পুঁজিবাদী ছিল আপন গর্বে স্ফীত—সমস্ত দুনিয়া মাথা খুঁড়ে মরত তার পায়ে। বাদশাহ তার দাস, মন্ত্রী তার গোলাম, সন্ধি-বিগ্রহের চাবিকাঠি তারই হাতে। পৃথিবী তারই উচ্চাভিলাষের সম্মুখে নতশির! দেশে তারই প্রতিপত্তি।

কিন্তু আজ নতুন সভ্যতার সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়েছে। উপড়ে ফেলেছে এই নাটকীয় পুঁজিবাদের শিকড়। এই সভ্যতার মূল চিন্তা ধারা এই: শারীরিক অথবা মানসিক শক্তির মাধ্যমে কিছু উৎপাদন করে যে মানুষ, সে রাষ্ট্র ও সমাজের পরম শ্রদ্ধেয় সদস্য। আর যে কেবল অন্যের পরিশ্রম অথবা বাপ-দাদার সঞ্চিত ধনের উপর আমীরি করে বেড়ায়—সে ঘৃণ্যতম ব্যক্তি। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তার নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার নেই, আর সে

নাগরিক অধিকারেরও উপযুক্ত নয়। পুঁজিবাদী এই নতুন শক্তির মুখোমুখি উৎকণ্ঠ, উদ্বিগ্ন ও ক্রুদ্ধ হয়ে উন্মত্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত দুনিয়ার পুঁজিপতির সম্মিলিত কণ্ঠ এই নতুন সভ্যতাকে অভিশাপ দিচ্ছে! ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা আর অন্তরাত্মার নির্দেশ মেনে চলার স্বাধীনতাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে—এই অভিযোগ, অনুযোগ করা হচ্ছে। নতুন নতুন কলঙ্কের মার্কামারা হচ্ছে এই নবোদ্ভিন্ন সভ্যতার উপর। নতুন নতুন মিথ্যা অভিযোগের বোঝা চাপানো হচ্ছে। কৃষ্ণ হতে কৃষ্ণতর মসীলেপন ও চরমতম কুৎসিতরূপে চিত্রণের এই সমস্ত কায়দাগুলো কাজে লাগিয়ে অপপ্রচার করা বিত্তবানের পক্ষে সুলভ হয়েছে। কিন্তু এ সেই সত্য যা নাকি এই অন্ধতামস ভেদ করে পৃথিবীময় আপনার উজ্জ্বল দীপ্তি বিকিরণ করে।

এটা নিঃসন্দেহ যে, এই নতুন সভ্যতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূলোৎপাটন করেছে—ভেঙে দিয়েছে তার হিংস্র নখদন্তের ক্রুদ্ধতা। তাদের রাষ্ট্রে আর একজন পুঁজিপতির লক্ষ মানুষের রক্তশোষণ করে স্ফীত হয়ে ওঠবার অবকাশ নেই। আজ আর তার স্বাধীনতা নেই যে, নিজের লাভের জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ায়, নিজের মাল কাটতির জন্য যুদ্ধ বাধায়, গোলাবারুদ আর যুদ্ধের জিনিসপত্র বানিয়ে দুর্বল রাষ্ট্রকে দমন করে। অবশ্য এসব করার স্বাধীনতাই যদি স্বাধীনতা হয়, তবে এই নতুন সভ্যতার স্বাধীনতা নেই। কিন্তু যদি স্বাধীনতার অর্থ হয়, জনসাধারণের জন্য আলো-বাতাস পূর্ণ গৃহ, পুষ্টিকর আহার, পরিচ্ছন্ন গ্রাম, আমোদ-প্রমোদ ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক পাখা এবং আলো, সস্তা এবং দ্রুত ও সুলভ বিচার ব্যবস্থা, তাহলে এই সমাজ ব্যবস্থায় আছে সেই স্বাধীনতা আর স্বাতন্ত্র্য যা নাকি কোনো সভ্যতম বলে পরিচিত জাতির পক্ষেও একান্ত দুর্লভ। ধর্মের স্বাধীনতার অর্থ যদি হয় পুরোহিত, পাদ্রী, মোল্লা প্রভৃতি পরশ্রমভোগীদের গর্বোদ্ধত উপদেশ আর অন্ধ বিশ্বাস জর্জরিত রীতি রেওয়াজের অনুসরণ, তাহলে একথা নিঃসন্দেহ যে, সেখানে এই স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসের অর্থ যদি হয় লোক-সেবা, সহিষ্ণুতা, সমাজের জন্য ব্যক্তির আত্মদান, মঙ্গল কামনা, দেহমনের পবিত্রতা, তাহলে এই সভ্যতায় ধর্মাচরণের যে স্বাধীনতা আছে অন্য দেশে তার দর্শন পাওয়া যাবে না।

যেখানে ধনের আধিক্য ও স্বল্পতার ভিত্তির উপর অসাম্য প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈর্ষা, জোর-জবরদস্তি, বেইমানী, মিথ্যা অভিযোগ আরোপ, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার এবং সারা দুনিয়ার দুগুণগুলি অনিবার্যরূপেই বর্তমান। যেখানে ধনের আধিক্য নেই, অধিকাংশ মানুষ একই অবস্থাতে বাস করে, সেখানে ঈর্ষাই বা কেন আর জবরদস্তিই বা কেন? সতীত্ব বিক্রয়ই বা কেন আর ব্যভিচারই বা কি জন্য? মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমাই বা কেন? চুরি-ডাকাতিই বা কেন? এই সমস্ত পাপ তো ঐশ্বর্যের অবদান, অর্থের প্রসাদ, পুঁজিবাদী সভ্যতাই এর স্রষ্টা। সেই এদের পালন করছে আর সঙ্গে সঙ্গে চাইছে যে, যারা দলিত, উৎপীড়িত এবং পরাজিত তারা একে ঈশ্বরের বিধান মনে করে নিজের অবস্থায় তুষ্ট থাকুক।

তাদের পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্র বিদ্রোহের ভাব দেখা গেলে, মাথা ভাঙবার জন্য পুলিস আছে, আদালত আছে, আছে কালাপানি। তুমি মদ খেয়ে তার নেশা থেকে রেহাই পেতে পার না। এ অসম্ভব যে, তুমি আগুন লাগাবে অথচ চাইবে যে তার শিখা যেন না ওঠে। অর্থ তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে এনেছে এই পাপের পসরা আর পৃথিবীকে বানিয়ে তুলেছে এক নরককুণ্ড। এই লক্ষ্মীর আরাধনা বন্ধ করুন, সমস্ত পাপ আপনা থেকেই বিদায় নেবে শিকড় না উপড়ে শুধু পত্রমোচন, সে যে একান্তই নিষ্ফল। এই নতুন সভ্যতা ধনাঢ্যতাকে হেয়, লজ্জাকর আর মারাত্মক বিষ বলে মনে করে। সেখানে যদি কোনো লোক আমীরি চালে চলে, তাহলে সে লোকের ঈর্ষা উদ্রেক করে না বরং তাকে অপাংক্তেয়, ব্রাত্য মনে করা হয়। অলঙ্কারমণ্ডিত হলেই কোনো স্ত্রীলোক সুন্দরী বলে বিবেচিত হয় না, বরং ঘৃণার পাত্রী হয়ে ওঠে। সাধারণ জনসমাজ থেকে জীবনযাত্রার উঁচু ধরন-ধারণ সেখানে নির্লজ্জতারই সমান। মদ খেয়ে মাতলামী করা যায় না। কারণ অধিক মদ্যপানকে অন্যায় বলে মনে করা হয়—অবশ্য ধর্মীয় দৃষ্টিতে নয়, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ অত্যধিক মদ্যপানের ফলে মানুষের ভিতর ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় আর শ্রমশীলতা লোপ পায়।

একথা অবশ্য ঠিক যে, এই সমাজব্যবস্থা ব্যক্তিকে এই স্বাধীনতা দেয়নি যে, সে জনসাধারণকে নিজের উচ্চাভিলাষ তৃপ্তির উপকরণ বানাতে পারে

আর নানা ছল-চুতায় তাদের পরিশ্রম ভাঙিয়ে মুনাফা করতে পারে বা সরকারী পদপ্রাপ্ত হয়ে মোটা মোটা অঙ্কে নিজের পকেট ভারী করে আর গোঁফে তা দিয়ে বেড়ায়। ওখানে সর্বাপেক্ষা উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিরও বেতন একজন কারিগরের সমানে। তিনি গগনচুম্বী প্রাসাদে বাস করেন না, তিনচারটে কামরা নিয়েই তাঁকে থাকতে হয়। তাঁর পত্নী, রাণী অথবা বেগম সাহেবার মতো বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ করে বেড়ান না—বরং প্রায়ই শারীরিক মেহনত করেন বা খবরের কাগজের দপ্তরে কাজ করেন। সরকারী পদলাভ করে তিনি নিজেকে লাট সাহেব মনে করেন না। মনে করেন জনগণের সেবক বলে। পুঁজিবাদী সভ্যতাপ্রেমিক কেন এই সমাজ-ব্যবস্থাকে পছন্দ করতে যাবেন, যাতে তাঁর অন্যের উপর রাজত্ব চালানোর জন্য সোনারূপার পাহাড় গড়ে তুলবার কোনো সুবিধাই নেই। পুঁজিপতি ও জমিদার তো এই সভ্যতার কল্পনাতেই শিউরে ওঠেন। তাঁদের হৃদকম্পের কারণ আমরা বুঝি। কিন্তু যখন দেখি তারাও—যারা নিজেদের অজ্ঞতারবশে এই নতুন সভ্যতাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ ক'রে এই পুঁজিবাদী সভ্যতারই কাজ হাসিল করতে সাহায্য করছে, তখন তাদের দাসমনোবৃত্তি দেখে আমাদের হাসিই পায়। যাঁর ভিতরে মনুষ্যত্ব, আধ্যাত্মিকতা, উদারতা ও সৌন্দর্যবোধ আছে, তিনি কখনও গৃধনতা, স্বার্থপরতা আর মানুষের নিকৃষ্টতম বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রশংসা করতে পারেন না।

ভগবান তোমাকে বিদ্যা ও কলাসম্পদ দান করেছেন; তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগ এই যে, তার সাহায্যে জনসমাজের উপর রাজত্ব চালাবে—তার রক্তশোষণ করবে আর তাকে ধোকা দেবে।

ধন্য সেই সভ্যতা, যা এই পুঁজিপতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে খতম করেছে। অচিরেই সমস্ত দুনিয়া তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। এই সভ্যতা অমুক দেশের সমাজগঠন অথবা ধর্মের সঙ্গে খাপ খায় না কিম্বা তার পরিবেশের অনুকূল নয়—এ তর্ক নিতান্তই অসঙ্গত। খ্রীষ্টধর্মের বীজ জেরুজালেমে অঙ্কুরিত হয়েছিল কিন্তু আজ সমস্ত বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে তার সৌরভ। বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারতে জন্ম নেয়, কিন্তু অর্ধেক পৃথিবী তাকে গুরুদক্ষিণা দিয়েছে। মানব সমাজ সবগ্র বিশ্বে একই, ছোট খাট কথায় প্রভেদ থাকতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়ের বিচারে সম্পূর্ণ মানব জাতির কোনো ভেদ নেই। যে শাসন

বিধান এবং সমাজ-ব্যবস্থা এক দেশের পক্ষে কল্যাণকর তা অন্য দেশের পক্ষেও কল্যাণপ্রসূ হবে। পুঁজিবাদী সভ্যতা আর তার ভাড়াটে গুণ্ডার দল তাদের সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে বিরোধিতা করবে, তার সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করবে, জনসাধারণকে ধোকা দেবে, ধুলো দেবে তার চোখে, কিন্তু সত্যের গতি রুখবে কে! তার জয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্রাবণ, ১৩৫৯